আগামীকাল

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

: প্রাপ্তিস্থান :

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণঃ ১৯৬৫

শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
ভুবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীরঞ্জিতকুমার মাইতি
৫১ বি, ঝামা পুকুর লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী কাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের মাসিক অধিবেশন বসবে সন্ধ্যা সাতটায়, এখন ঘড়িতে বাজল চারটে। অনেক দেরি। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট এককড়ি। প্রদীপে আলো জ্বালাবার লোকের অভাব হয়নি, কিন্তু তেল যোগাতে হয় একাকী তাকেই। তার গৃহেই সঙ্ঘের অফিস, তার বসবার ঘরেই বসে সঙ্ঘের বৈঠক। মেঝের আগাগোড়া সতরঞ্চি পাতা, তার উপর ফরসা চাদর এবং দেয়ালের ধারে ধারে রাখা অনেকগুলি তাকিয়া। এরই একটা অধিকার করে এককড়ি গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে চোখ বুজে বোধ করি বা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করল জলধি। আসন গ্রহণ করে ডাকলে, এককড়িদা কি ঘুমিয়ে পড়লেন ?

এককড়ি চোখ মেলে উঠে বসলো। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, গভীর চিন্তামগ্ন ছিলাম। তার পরেই একটু হেসে ফেলে বললে, ঘুমিয়ে পড়লেও দোষ নেই রে জলধি, বয়স ত হ'লো। এখন এইটেই স্বধর্ম।

জলধিও হাসলে, বললে, ইস! ভারী ত বয়েস!

যৌবনের প্রথম দিকটা এককড়ির শেষ হয়-হয়। রগের কাছটায় চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু সুগঠিত দেহে শক্তি ও উদ্যমের অবধি নেই। এককড়ি বিপত্নীক। প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে আছে শুধু তার বছর-দশেকের মেয়ে আর এক বিধবা পিসী। পাটের ও তিসির ব্যবসায়ে পিতা এত অর্থসম্পদ রেখে গেছেন যে, তাকে প্রভূত বলাও চলে। পরে পরে অনেকগুলি ভাই-বোন মরার পরে এককড়ির জন্ম, তাই ছেলেবেলায় এত সাবধানে তাকে রক্ষা করা হয় যে, সে প্রায় একপ্রকার পাগলামির অন্তর্গত। পিতা স্কুলে পর্যন্ত কখনো ছেলেকে পাঠান নি,—বাড়িতেই নিযুক্ত ছিল মাস্টার ও পণ্ডিত, নাম-জাদা ও উচ্চ বেতনের। ছাত্রের সম্বন্ধে তাদের সার্টিফিকেটের ভাষা ছিল উদার, কিন্তু বিদ্যার পরীক্ষা যাকে দিতে হয়নি তার বাজার-দর কত এবং বাগ্‌দেবী সত্যই তাকে বর দিলেন কি পরিমাণ, এ তথ্য নিরূপণ করা আজ কঠিন। পাঠ সাঙ্গ হ'লো, শিক্ষকগণ বিদায় নিলেন, তবু লাইব্রেরি ঘরেই দিন কাটতো তার এতদিন। পিসীমার বহু অশ্রুপাত অগ্রাহ্য করেও সে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি, বইয়ের শেলফগুলো ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানে না। এমনি করেই তার দিন কাটতে পারতো, কিন্তু পারলো না। হঠাৎ বন্দেমাতরমের বিরাট কঠিন ধ্বনি কোটর থেকে টেনে তাকে বার করলে। তার পরে জেলে গেলো, দলাদলির আবর্তে পড়ে নাকে-মুখে পাঁক ঢুকলো ; দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রদত্ত নানা বিচিত্র বিশেষণের মালা শিরোপা পেলে, শেষে একদিন যাদের সংসার চালিয়েছিল তারাই চোর বলে যখন কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে, তখন সে

আর সইলো না, পলিটিক্সে জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আবার তার লাইব্রেরি-ঘরে এসে আশ্রয় নিলে। কিন্তু দেশোদ্ধারের নেশা তখন পাকা করে ধরেচে, তাই পুরোনো বইয়ের মধ্যে আর তার মৌতাতের খোরাক মিললো না, আবার তাকে অস্থির করে তুললে। এবার কতকগুলি ছেলেমেয়ে জুটলো তারাও তখন পলিটিক্সে তোবা ক'রে বেকার হয়ে পড়েচে—বললে, এককড়িদা, রাজনীতি আর না, কিন্তু জীবনটাকে কি নিতান্তই ব্যর্থ করে আনবো, দেশের একটা কাজেও লাগবে না? এ দুর্গতি থেকে বাঁচাও— যাতে লোক লাগিয়ে আমাদের দিয়ে তুমি কাজ করিয়ে নাও।

এককড়ি রাজী হ'লো। স্থির হ'লো এবারের প্রোগ্রাম সোশাল সার্ভিস। গ্রামে, নগরে, পল্লীতে--সর্বত্র কেন্দ্র সংস্থাপন করা। জলধি বললে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, অর্জনে, সঞ্চয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সচেতন করতে না পারলে ঘরে-ঘরে কেবল বিদ্বেষ আর কলহ দিয়েই সংকট মোচন হবে না। যোগ্য না হলে যোগ্যতার পুরস্কার পাবে কার কাছে? পেলেই বা থাকবে কেন? ধনীর কুপুত্রের মতো বিত্ত-সম্পদ যে দেখতে দেখতে লোপ পাবে— চক্ষের পলক সইবে না,— কমলা অন্তর্হিত হবেন। এ-সব যুক্তি শাশ্বত সত্য—অকাট্য। এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না।

অতএব প্রতিষ্ঠিত হ'লো কল্যাণ-সঙ্ঘ। গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হ'লো শাখা-প্রশাখা। অধ্যক্ষ এককড়ি, সচিব জলধি। নানা শাখার সদস্য সংখ্যা দু'শোর বেশী। আজকের দিনে মাসিক অধিবেশনের বৈঠকে সাধারণতঃ হাজির যারা হয় সেও জন-পঞ্চাশের কম নয়। দূরের সদস্যদের ট্রেনভাড়া দেবার ব্যবস্থা আছে।

নিচের যে ঘরটায় সঙ্ঘের অফিস সেখানে বসে যে মেয়েটি অবিশ্রাম কেরানীর কাজ করে তার নাম মণিমালা। মাসিক ত্রিশ টাকায় সে ভর্তি হয়, সম্প্রতি খুশী হয়ে এককড়ি মাইনে বাড়িয়েছে পঞ্চাশ টাকায়। গোড়ায় এককড়ি তাকে বাড়িতে থাকতেই বলেছিল, কারণ ঘরের অভাব নেই, কিন্তু সে রাজী হয়নি। কাছেই কোথায় তার বাসা—সেখানে নিজে রেঁধে খায়। একলা থাকে। একটা দিনের জন্যে তার কামাই নেই, একটা কাজে তার শৈথিল্য প্রকাশ পায় না। একদা অসহযোগের প্রবল বন্যায় ভাসতে ভাসতে ঠেকতে ঠেকতে সে—এ-অঞ্চলে এসে পড়ে। সঙ্গে বাবা ছিলেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে জেলের দুঃখ তাঁর সইলো না—বাইরে এসে যশোর না কোথায় উদরাময়ে মারা গেলেন। মণিমালার প্রাক্তন ইতিবৃত্ত এর বেশী কেউ জানে না। স্বল্পভাষী মেয়ে,—নিজের মুখে প্রায়ই কিছু বলে না। দেখতে সে সুন্দরী নয়, মুখের 'পরে একটা পুরুষালি ভাব, কাউকে টানে, কাউকে দূরে ঠেলে। বর্ণ কালোর দিকে, কিন্তু মেদ-মাংসের বাহুল্যবর্জিত দীর্ঘ-ছন্দের দেহ কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু, তা দেখামাত্রই বুঝা যায় এবং জন্মভূমি যে পূর্ববাঙলায় কোন এক স্থলে সে পরিচয়ও ধরা পড়ে তার উচ্চারণে। মনে হয় একদিন কলেজে পড়েছিল সে নিশ্চিত, হয়ত বা কিছু কিছু পরীক্ষার পাসও করেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে বলে না, শুধু হাসে। তার ইংরাজি ও বাংলা লেখার শুদ্ধতা ও ক্ষিপ্রতা

দেখে এককড়ি অবাক হয়ে যায়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে প্যামফ্লেট ছেপে প্রচার করার বিধি আছে। আগে রচনার ভার ছিল জলধির, এখন পড়েছে মণিমালার পরে। পূর্বে এই লেখাটা আদায় করতে এককড়ি গলদঘর্ম হ'তো, এখন বলামাত্র লেখা আপনি আসে। জলধি সেক্রেটারি, কাটকুট না করে কলম না চালিয়ে তার মান বাঁচে না। এককড়ি বিরক্ত হয়ে মণিমালাকে আড়ালে ডেকে বলে, ফুলের ক্ষেতে ফাল চালাবার যদি ওর শখ, কিন্তু উলুবনের ত অভাব নেই,—আমাকে বললে একটা দেখিয়ে দিতেও পারতাম,— তাতে কাজ না হোক অকাজ ঘটতো না। কিন্তু এ লেখাটা যে দশজনে পড়বে মণি, একে নাম-সই করে ছাপাতে দেবো কি করে? ওকে ব'লো এবার থেকে ও-ই যেন দস্তখত করে।

মণিমালা জলধির হয়ে সলজ্জে বলে, কিছু খারাপ হয়নি এককড়িদা, প্রেসে পাঠিয়ে দিন। সংশোধনগুলো আমার ভালই লেগেচে।

সেই ভাল, বলে এককড়ি ছাপাতে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্ঘের বাইরের চেহারার একটা নমুনা দিলাম, ভিতরের মূর্তিটা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

জলধি হাতঘড়িটা মিলিয়ে দেখে বললে, চারটে পনেরো— ভিড় জমতে ঘণ্টা-তিনেক দেরি। সঙ্ঘের সেক্রেটারি আমি, সকাল সকাল আসাই আমার উচিত। খেয়েদেয়েই আসবো ভেবেছিলাম কিন্তু ঘটে উঠলো না। পথের মধ্যে ভাবলাম সুরেন আর তারিণীকে ডেকে নিই, কিন্তু পরের কাছে আপনি পাছে মন না খোলেন সেই ভয়ে বিরত হলুম।

এককড়ি বললে, সুরেন, তারিনী পর হ'লো? তবে আপনার বলো কাকে?

বলি, শুধু আমার নিজেকে। ওদের সামনে মন খুললেও আমি মুখ খুলতে পারতাম না। ইতিমধ্যে গোটা-দুই অনুরোধ আছে দাদা।

কিসের অনুরোধ?

একটা এই যে সঙ্ঘের আপনিই দেহ, আপনিই প্রাণ। আত্মার আলোচনা করবো না, অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ে তিনি চিন্তার অনধিগম্যই থাকুন। আমরা শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনটে বছর ত এই দেহযন্ত্রটা টেনে টেনে বেড়ালাম, এবার অনুমতি করুন পরের হাতে ঠেলে ফেলবার আগেই এর গঙ্গাযাত্রাটা সমাধা করে যাই। দোহাই দাদা, অমত করবেন না, হুকুমটি দিন।

প্রার্থনার রসটা এককড়ি বুঝলো না, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কার গঙ্গাযাত্রা করতে চাও, আমাদের সঙ্ঘের।

জলধি বললে, ঠিক তাই। মরবেই ত, শুধু নিশ্বাসটুকু বেরোবার পূর্বে একটু সমারোহে ঘাটে নিয়ে যাওয়া।

এককড়ি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, আফিস-ঘরে খাতাপত্রগুলো আছে। সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। তা' হোক, ওগুলো শুধু মুমূর্ষুর গায়ের নোংরা কাপড়-চোপড়। দাম

কানাকড়িও নয়, বরঞ্চ রোগের বীজাণু ছড়াবার আশংকা আছে। চলুন, সদস্যবৃন্দ সমাগত হবার পূর্বে দেশলাই জ্বালিয়ে সৎকার করে ফেলা যাক।

এককড়ি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, আজ তোমার হ'লো কি জলধি?

জলধি বললে, কি হয়েছে সে বিবরণ আপনাকে সবিস্তারে দেবার নয়। মণিমালা উপস্থিত থাকলে সে হয়ত আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতো।

এককড়ি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো, বোধ হয় মনে মনে কারণ বোঝবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হ'লো না। প্রশ্ন করলে, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

জলধি বললে, এটা আরও বেশী দরকারি দাদা। আপনার মামা মস্ত লোক, তাঁকে ধরে করপোরেশনে হোক, মিউনিসিপালিটিতে হোক, জেলাবোর্ডে হোক, ইন্সিওর কোম্পানিতে হোক,—অর্থাৎ আপনাদের স্বরাজ-পাণ্ডারা যেখানে বেশ একটু আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে পেরেছেন, আমার চাকরি একটা করে দিন। যেন দু'মুঠো খেতে পরতে পাই।

এককড়ি ক্ষুব্ধ মুখে, কাতর স্বরে বললে, দু'মুঠো খেতে পারকে কি পাও না জলধি?

পাই বৈ কি দাদা, নইলে বেঁচে আছি কি করে? দেশের সেবা করি, একেবারে নিঃস্বার্থ। গোলামি করিনে বলে বলে লোক ঠকিয়ে ইজ্জত বজায় করি—ডান-হাতটা ত রেখেচি দিনরাত বক্তার ঘঁষিতে পাকিয়ে। তবু অলক্ষ্যে অগোচরে বাঁ-হাতের তেলোর পরে আপনার ছিটে-ফোঁটা মুষ্টিভিক্ষে যা এসে পড়ে তাতেই শোধ করি মেসের দেনা, খদ্দরের বিল। কুকুর-বিড়ালে যেভাবে বাঁচে প্রায় তেমনি। আপনি বড়লোক, বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ আপনার হিসেবের মধ্যেই নয়। কিন্তু আর নয় দাদা, এর থেকে ছুটি দিন।

এককড়ি চুপ করে রইলো, কথা কইলে না। দেয়ালের ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। যে চাকরটা তামাক বদলে দিতে ঢুকেছিল তাকে বললে, গোপাল, নীচে থেকে মণিদিদিকে ডেকে দিয়ে যা ত। জলধি, পরের কাছে লজ্জাই যদি বোধ করো—

না-না দাদা, পর কোথায়? যে সব মহাত্মাদের মাঝে ঘোরাফেরা করি তাঁরা সবাই অন্তরঙ্গ, সবাই আত্মীয়। তাঁদের অজানা কিছুই নেই। বছর-দশেক স্বদেশসেবা-ব্রতে লেগে আছি, লজ্জা থাকলে বাঁচবো কেন?

চাকরটা গুড়গুড়ির মাথায় কলকে রেখে নীচে যাচ্ছিলো, জলধি তাকে বারণ করে বললে, তোর কাজে যা। একটু হেসে বললে, মণিমালা আসেনি এককড়িদা, মিছে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়ে ওকে লাভ কি?

আসেনি? এমনধারা ত কখনো হয় না।

হয় না বলেই হতে নেই দাদা? আজ তার দেহটা একটু বে-এক্তার—আমিই আসতে বারণ করে দিয়েছি।

কিন্তু অধিবেশনের কাগজপত্র ?

কাগজপত্র আজ থাক গে।

এককড়ি চিন্তিত সুরে বললে, যাদের কখনো কিছু হয় না, তাদের একটা কিছু হলে সহজে সারতে চায় না। ভয় হয় পাছে ওকে ভোগায়।

জলধি চুপ করে রইলো। এককড়ি বলতে লাগলো, চমৎকার মেয়ে। যেমন বিদ্যে-বুদ্ধি, তেমনি চরিত্রের নির্মলতা, সাহসও তেমনি,— ভয় কাকে বলে জানে না।

জলধি সায় দিয়ে বললে, সাহস আছে তা মানি।

আমাদের গোপাল ওর বাসা চেনে। সন্ধ্যের পরে তাকে পাঠাবো। যদি ডাক্তারের দরকার হয়, দত্তসাহেবকে ডেকে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার-বদ্যির দরকার হবে না এককড়িদা, বরঞ্চ গোপালকে দিয়ে বলে পাঠাবেন বেশী অত্যাচার না করে।

কিন্তু অত্যাচার ত সে করে না, জলধি।

আপনি বড় সেকেলে দাদা। সব তাতেই পূর্বকালের দোহাই পাড়েন, পরিবর্তন মানতে চান না। সে যা হোক গে, মণিমালা এখন যা শুরু করেছেন, সাধারণ মানুষে তাকে অত্যাচার না বলে পারে না। ওঁর বাসায় গিয়ে দেখলাম বিছানায় শুয়ে, আর সেই বন্ধুটি শিয়রে বসে দিচ্ছে মাথা টিপে।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে বন্ধু আবার কে? এ কথা ত কখনো শুনিনি!

আবার সেই পূর্বকালের নজির! কিন্তু তে হি নো দিবসা গতঃ—বন্ধু কিছুদিন হ'লো এসেছেন। কোথায় নাকি আগে আলাপ হয়েছিল। চোখ রাঙ্গা, গলা ভেঙ্গেছে; জিজ্ঞেস করলাম, ঠাণ্ডা লাগলে কি করে মণি? মণি লোকটিকে দেখিয়ে বললে, কাল রমেনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বজবজে। বাস ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরে দু'জনে হাঁটলাম অনেক দূর। গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো বটগাছ, তার তলায় গিয়ে দু'জনে বসে পড়লাম। আকাশে চাঁদ উঠলো, পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামলো জ্যোৎস্নার আলো, সুমুখে নদীর জলে দিলে স্বপ্ন মাখিয়ে— ভুলে গেলাম ওঠবার কথা। হঠাৎ খেয়াল যখন হ'লো তখন ঘড়িতে দেখি বারোটা বেজে গেছে। অত রাত্রে ফেরবার বাস পাওয়া যাবে কোথায়, কাজেই রাতটা কাটাতে হ'লো গাছতলায় দাঁড়িয়ে। জলের ধারে খোলা জায়গায় একটু ঠাণ্ডা লাগলো বটে, কিন্তু সময় কাটলো যে কি করে দু'জনের কেউ টেরই পেলাম না। কাব্যের চরম।

এককড়ি হতবুদ্ধি হয়ে বললে, বলো কি জলধি, এ কি সত্যি ঘটনা, না সে তামাশা করলে?

খামকা তামাশার ত কোন হেতু ছিল না দাদা। সে সত্যি কথাই বলেছে।

বলতে লজ্জা পেলে না?

না। বরঞ্চ শুনে আমিই লজ্জা পেলাম ঢের বেশী। আসবার সময় বললাম,

এ বয়সে এ্যাডভেনচারের রস আছে মানি, কিন্তু এককড়িদা শুনে এ্যাপ্রিসিয়েট করবেন বলে ভরসা করিনে। হয়তো বা অ-খুশীই হবেন। সে বললে, তাঁর অ-সুখী হবার কারণ ত নেই। আমি ছেলেমানুষ নই, এ তাঁর বোঝা উচিত।

এককড়ি আস্তে আস্তে বললে, বিলাতী গল্পের বইয়ে এ রকম ঘটনা পড়েছি, কিন্তু দেশটাকে কি ওরা বিদেশ বানিয়ে তুলতে চায় নাকি ?

জলধি ক্রুর হাসি হেসে বললে, ওরা মানে মণিমালা আর নতুন তার বন্ধু। কিন্তু দেশে ওরা ছাড়াও অন্য লোক আছে তারা এ-সব পছন্দ করে না। অন্ততঃ আমি ত না। এর পরেও যদি আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে হয়, আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের নামটা একটুখানি পালটে নিতে হবে।

এককড়ি নিরুত্তরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, এতাবৎ সঙ্ঘের বাবদে আপনার টাকা কম যায়নি। আমাদের টাকা নাই বটে, কিন্তু যা গেছে তার হিসেব করতেও চাইনে। শুধু আবেদন, এবার এই বেকার যুবকটির একটা চাকরি করে দিন।

এককড়ি তেমনি নীরবেই বসে রইলো, জলধির কথাগুলো তার কানে গেল কি না সন্দেহ। দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজলো। গোপাল এসে খবর দিল বাবুরা আসছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমেন বললে, আমার এক কাকা ছিলেন, তাঁর দু-পাটি দাঁতই বাঁধানো। খুড়ো দামী টুথপেস্ট ঘষতেন, বিশ্বাস ছিল ওতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। তোমার জলধিরও বুদ্ধি দেখি তেমনি। ও জানে পাহারা জিনিসটা দরকারী, অতএব তোমাকে ঘিরে কষে পাহারা লাগিয়েছে। শুনি ও-ই না কি তোমার আধা-মনিব। তাই মনিবানার দুরমুশ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে নিতে চায় মণিমালার নৈতিকতার বনেদে কোথাও আলগা মাটি আছে কি না। ওকে খামকা বজবজের গল্প করতে গেলে কেন ?

সত্যি কথা বলায় দোষটা হ'লো কি ?

হায় রে কপাল ! সত্যি বোঝার শক্তি থাকলে বজবজের ব্যাপার শুনে ও হাসতো, বেকুবের মতো মুখ ফোলাতো না। ভাবি, তোমাকে ভালবাসতে গেছে ও কোন্ বুদ্ধিতে ? ইডিয়েট !

মণি হেসে ফেললে। বললে, তোমার বুদ্ধিই বা এমন কি ধারালো ! তোমার বিদ্যের বিস্তৃতি দেখে অবাক হই, শুনতে শুনতে হুঁস থাকে না, গঙ্গার ঘাটে বারোটা বেজে যায়,—কিন্তু বুদ্ধির বেলায় সব পুরুষই সমান। তবু, জলধিবাবুর প্রশংসা করি, আমাকে সে আর যা-ই ভাবুক, অন্ততঃ রূপসী ভাবে না। কিন্তু তুমি আরও বেহায়া, আরও বড় ইডিয়েট।

ওগো আমি যে কালী-ভক্ত। বলিনে তুমি রূপসী, বলি তুমি ভীমা ভয়ংকরী, —তোমার মুখের হাঁ কুমীরের মত গায়ের রং অমাবস্যা-রাত্রির চেয়ে গাঢ়তর, তুমি আশ্চর্য! দেবতারা বোঝেন না তা নয়, কিন্তু ভক্তের মুখে বাড়িয়ে শুনতে ভালবাসেন। যদি আমি বাঙালী না হয়ে হিন্দুস্থানী হতাম, উপাস্য দেবতা হতেন হনুমানজী, তা হলে তাঁরও পোড়ামুখে তেল-সিঁদুরের ঘন প্রলেপ লাগিয়ে হাতজোড় করে বলতাম, হে জবাকুসুমসংকাশ, তুমি তীক্ষ্নদংষ্ট্র, বজ্রনখ, তোমার গায়ের রোঁয়ায় ইন্দ্রধনুর দ্যুতি, তোমার ল্যাজ গিয়ে ঠেকেছে আকাশে, তোমার মত বীর দ্বিতীয় নেই, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। হনুমানজীর অজ্ঞাত থাকতো না ভক্ত খোশামোদ করচে, কিন্তু বর দিয়েও ফেলতেন। অভীষ্ট লাভ হ'তো।

মণি হেসে বললে, হনুমানজী তোমার গলায় ল্যাজ জড়িয়ে সাত সমুদ্দুর পারে আসতেন—যেখান থেকে এসেচ সেইখানে।

আহা, সে-ই কি কম লাভ মণি! ফিরে যাবার ভাড়া লাগতো না, এরোপ্লেনের চেয়েও শিগগির গিয়ে পৌঁছতাম। তাতে অন্ততঃ এই লাভ হ'তো, ওই বর্বরটাকে হিংসে করে বেড়ানোর দুর্গতি থেকে রক্ষে পেতাম।

সে দুর্গতি থেকে আমিই তোমাকে বাঁচাবো। এ বাসায় আর ঢুকতে দেবো না।

ঢুকতে দেবে না? কাকে? আমাকে, না তাকে?

তোমাকে। আমার রংটা কালো মানি, মুখের হাঁও একটু বড়, কিন্তু তাই বলে কুমীরের মতো?

না না, অত বড় নয়, একটু ছোট। কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেচ, অতিশয়োক্তি শুনতে যে তোমরা ভালবাস মণি। তাই ত বাড়িয়ে বলি।

আর কাউকে শোনাও গে, আমার দরকার নেই।

কে বললে নেই? সবচেয়ে দরকার তোমারই। যে মেয়ের দেহের রূপ আছে, বাপের টাকা আছে, তাকে বাইরে থেকে যাচাই করে নেবার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু সম্পদ যার অন্তরে লুকোনো, তার আমার মত একজন অকপট ভক্ত নইলে চলেই না। কিন্তু সে কি ওই জলধি? বুঝেছি, ওর তোমাকে ভাল লেগেচে। কেন জানো? ও ভেবেছে, ও যে তোমাকে পছন্দ করে সে ওর নিজেরই মহত্ত্ব! তোমার নিজের গুণে নয়, ওর স্বকীয় ঔদার্যে।

কিন্তু, তুমি পছন্দ করেছ কার গুণে শুনি?

রমেন গম্ভীর হয়ে বললে, নেহাত মিথ্যে বলনি মণি। খুব সম্ভব তাই বটে। ওটা আমার নিজেরই বৃহত্ত্ব। নইলে তোমাকে হয়ত চিনতেই পারতাম না। কিংবা কি জানো মণি, নদীর স্রোতে যেখানটায় ঘূর্ণিপাকে ঘোরে, কুটোকাটা না বুঝে ও সেই দিকে ছোটে। ঘুরে ঘুরে আবর্তে ডুব মারে, তার পরে কোথায় যায় কে জানে। ছিলাম ইউরোপে, ছেলেবেলায় সেইটুকু পরিচয়, কতকাল পরে কি ভেবে হঠাৎ চিঠি লিখে খোঁজ নিলে, মন অমনি চঞ্চল হয়ে উঠলো। চাকরি ছেড়ে দিলাম, যা কিছু সম্বল

ছিল বিক্রি করে ভাড়া যোগাড় করে তোমার কাছে ছুটে এসে উপস্থিত হলাম। এর কি নিগূঢ় অর্থ নেই ভাবো? ঘূর্ণাবর্তের উপমাটা একটু চিন্তা করে দেখো। আর রূপের কথা যদি তোলো, একটু চেয়ে দেখলেই টের পাবে তুমি আমার পায়ের কড়ে আঙুলেও লাগো না। ইউরোপের গল্প নিজের মুখে আর করতে চাইনে, কিন্তু তোমাদের এই খাঁচা-বোঁচা বেঁটের দেশের কত রূপসী মেয়ের মাথা ঘুরে যায় এমন চেহারা কি আমার নয়? সত্যি বলো!

মণি হেসে ফেলে বললে, কি বিনয়! প্রভুপাদ গোস্বামীরাও পর্যন্ত হার মানে। আচ্ছা রমেন, তোমার প্রণয়-নিবেদনের ভাষাটা কি তুমি মুখস্থ করে রেখেছ? রোজই ঠিক একই রকম বলো কি করে? কোথাও একটা কমা সেমিকোলন পর্যন্ত বাদ পড়ে না, হুবহু একই কথা প্রত্যহ বলতে তোমার লজ্জা করে না?

নিশ্চয় করে।

তবে বল কেন?

বলবার হেতু আছে মণি। দেবতাদের প্রসন্ন করার দুটো ধারা আছে। এক স্তব, আর এক মন্ত্র। স্তব মনের আবেগে যথা-ইচ্ছা বানানো যায়, তার একদিনের বাক্য আর একদিনের সঙ্গে মেলার দরকার নেই। শুনে দেবতা খুশী হয়ে বর দিতেও পারেন, না-ও পারেন। তাঁর অনুগ্রহ, ভক্তের জোর নেই। কিন্তু মন্ত্র তা নয়, ইচ্ছামত বানানো যায় না, মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হয়। উচ্চারণ নির্ভুল হলে দেবতার না বলবার জো নেই, চুলের ঝুঁটি ধরে বর আদায় হয়। একেই বলে সিদ্ধমন্ত্র। সাহেবরা বলে ম্যাজিক। বুনোদের মধ্যে এই মন্ত্রে যারা সিদ্ধিলাভ করেচে, সমাজের ভিতর তাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপের অবধি নেই—লোকে থরথর করে কাঁপে।

মণি বললে, বুনোদের মন্ত্র তুমিও জানো না, আমিও না। নিশ্চয় তার গভীর অর্থ আছে, কিন্তু তুমি যা আমার কাছে আবৃত্তি করো তার বারো আনার মানে হয় না।

রমেন বললে, শুনে আহ্লাদে তোমার পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করচে। আশা হচ্চে হাতড়ে হাতড়ে এতদিনে ঠিক জিনিসটিতে হাত লেগেছে। মণি, ও-বস্তু যত অর্থহীন হয় ততই হয় খাঁটি। একদম অবোধ্য হলে তার আর মার নেই—সেই হ'লো একেবারে সিদ্ধমন্ত্র। তখন দেবতার গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে অভীষ্ট আদায় করা যায়।

মণি গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললে। বললে, বুনোদের অনেক দেবতা, তাদের মন্ত্রসিদ্ধ ওস্তাদদের ভাবনা নেই—যাকে হোক একটা ধরতে পারলেই হ'লো, কিন্তু তুমি কোন্ দেবতার ঝুঁটি ধরে বর আদায় করবে শুনি?

এখন শুনে কি হবে? শুধু এইটুকু জেনে রাখো, ঝুঁটি খুললে তার চুল পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, সেইটি বাগিয়ে যখন ধরবো, তখন দেবতা আপনি টের পাবেন। কথাটি কবেন না, সুড়সুড় করে পিছনে পিছনে আসবেন। শুধু বাঙলা মুলুক নয়, সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত।

তোমার ভারী আস্পর্ধা রমেন।

আস্পর্ধাই ত। নইলে সব ছেড়ে এত দূরে আসতাম কোন্ সাহসে?

তোমার ভুল। তুমি জানো দেশের কাজে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েচি।

দিলেই বা গো। মন্ত্রের জোর যে তারও উপরে। দেশ-টেশ কোথায় ভেসে যায়।

মণি রাগ করে বললে, দেখো, মন্ত্র মন্ত্র করে চালাকি ক'রো না। আমার কুমীরের মতো হাঁ, অমাবস্যার মতো রং—আমার আশা তুমি ছাড়ো। সত্যি ভালোবাসলে কেউ অমন বলে না। তা আবার প্রিয়ার মুখের উপর। তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যেখান থেকে এসেছ সেইখানেই ফিরে যাও।

ফেরবার জো নেই মণি, ভাড়ার টাকা পাবো কোথায়?

আমি যোগাড় করে দেবো।

তা হলে সে-ই ভালো। দু-জনের ভাড়া যোগাড় করো।

দু-জনের নয়, একজনের। কিংবা আর একটা কাজ ক'রো না রমেন? নানা দেশের নানা ইউনিভারসিটি থেকে পাস করার যে লম্বা ফর্দ তোমার নামের পিছনে আছে তাতে বিদেশ ফিরে যাবার দরকার কি? চেষ্টা করলে এখানেই যে একটা বড় চাকরি পাবে। অনেক সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কেউ তাদের সম্বন্ধে এতটুকু কলঙ্কের আভাস পর্যন্ত দিতে পারে না, তারা এমনি মেয়ে। চিরদিন সাধ্বী পতিব্রতা হয়ে তোমার ঘর আলো করবে আমি লিখে দেবো। এমন কি, জামিন পর্যন্ত হবো। কথা দিচ্ছি তুমি সত্যিই সুখী হবে রমেন। শুধু একটি প্রার্থনা, যখন তখন এসে এক কথা নিয়ে আমাকে আর জ্বালাতন ক'রো না।—বলতে বলতে তার চোখ মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে এলো, বললে, তা ছাড়া নিজেকেও ত চিনি। আমার মতো একটা দজ্জাল দুর্দান্ত কুশ্রী মেয়ে নিয়ে তোমার হবে কি? আমি কি কোন অংশেই তোমার যোগ্য?

রমেন উত্তর দিলে, কোনদিন কি বলেচি তুমি আমার যোগ্য? নিজেকে কি আমিই চিনিনে? তোমার ঐ ভাল-ভাল সতীলক্ষ্মী বান্ধবীদের যথাকালে যথাযোগ্য পাত্রে অর্পণ ক'রো, আমি তিলার্ধ আপত্তি করবো না। কিন্তু জাত-সাপুড়ের কল্যাণকামনায় যদি উপদেশ করো তাকে গোখরো কেউটে ছেড়ে হেলে আর ঢোঁড়া সাপ নিয়ে খেলাতে, তবে বরঞ্চ পেশা ছেড়ে দেব, কিন্তু আত্মমর্যাদা নষ্ট করবো না। মরণ আছে জেনেও।

আমি বুঝি গোখরো কেউটে, আর তুমি জাত-সাপুড়ে?

আমি নয় ত কি ঐ জলধিটা? যে কেবল তোমার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করছে আর নানা ছলে পাহারা দিয়ে ফিরচে—সে?

তাই সে ফিরুক, কিন্তু তুমি আর আমাকে জ্বালাতন করতে পাবে না তোমাকে বলে দিলাম।

ওগো মণি, কাঁদবে তুমি কাঁদবে। এখন মস্ত বাহাদুরি হচ্ছে, কিন্তু একদিন বুঝবে, জ্বালাতন করবার যার কেউ নেই তার চেয়ে দুর্ভাগ্য মেয়েও আর জগতে নেই।

তোমার চিন্তা নেই রমেন, সম্প্রতি জলধিবাবু আছেন, তিনি একাই যথেষ্ট। যখন তিনিও থাকবেন না, তখন তোমাকে চিঠি লিখে জানাবো।

তাই জানিয়ো। কিন্তু আমার যে বিশ্বাস হতে চায় না, তুমি সত্যই আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও।

এতক্ষণে তার পরিহাসের হাল্কা কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো দেখে মণির মুখের পরেও একটা ব্যথার ছায়া পড়লো। হয়ত ভাবলে কি জবাব দেব, কিন্তু দেবার পূর্বেই নীচে সদর রাস্তায় একটা মোটর এসে দাঁড়ালো এবং পরক্ষণেই এককড়ির গলা শোনা গেল—মণি মণি, তুমি কোন্ ঘরটায় থাকো?

কে একজন বলে দিলে তেতলায় উঠে বাঁ-দিকের ফ্ল্যাটটা।

মণি ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সাড়া দিলে—আসুন এককড়িদা, এই আমার ঘর।

মিনিট-খানেক পরে এককড়ি এসে ঢুকলো, যে চাকরটা চিনিয়ে নিতে তার সঙ্গে এসেছিল, সে বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

এককড়ি আসন গ্রহণ করে চারিদিকটা একবার চেয়ে নিয়ে বললে, বাঃ—দিব্যি সাজানো-গোছানো ঘরটি ত!

মণি শুধু একটু হাসলে। কিন্তু পিছনের থেকে রমেন এ কথার জবাব দিয়ে বললে, তার কারণ আছে এককড়িদা। এ হ'লো লক্ষ্মীর বাসস্থল, গাছতলা হলেও এর পরিপাট্যটুকু আপনার চোখে পড়তই। আপনার বাড়ি কখনো দেখিনি কিন্তু জোর করে বলতে পারি সে-ত এত সুন্দর নয়। আপনি ভাবচেন, না দেখেই লোকটা বলে কি করে? বলি এইজন্যে যে জানি বৌ-ঠাকরুন স্বর্গীয় হয়েছেন, বেঁচে থাকলে এমন কথা মুখে আনতেও পারতাম না।

কথাগুলো এককড়ির ভালই লাগলো, তথাপি এই অপরিচিত যুবকের গায়েপড়া আলাপ ও আত্মীয় সম্বোধনে সে বিরক্ত-মুখে ফিরে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে আপনি?

আমি রমেন, দাদা। মণির ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না। কেবল বয়সে নয়, সকল দিকেই আপনার ঢের ছোট। আমাকে 'তুমি' বলতে হবে।

যাকে চিনিনে, কোনদিন আলাপ-পরিচয় নেই, তাকে কি হঠাৎ 'তুমি' বলা সাজে?

সাজে দাদা, সাজে। কিন্তু হঠাৎ ত নয়। আপনি চেনেন না বটে, কিন্তু মণির মুখ থেকে আপনাকে যে আমি খুব চিনি। সন্দেহ হচ্ছে, জলধিবাবু আমার প্রতি মন আপনার বিষিয়ে না দিলে 'তুমি' বলতে আপনি একটুও দ্বিধা করতেন না।

তিনি ঠিক কি কি বলেছেন জানিনে, কিন্তু মণিকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করলে টের পাবেন, আমি দুর্জন দুর্বৃত্ত মোটেই নয়। নিরীহ মানুষ, বিদেশে ছেলে পড়িয়ে খেতাম, বহু-দিন পরে অকস্মাৎ মণির একটা পত্র পেয়ে মন কেমন করে উঠলো, কোনমতে ভাড়াটা যোগাড় করে চলে এলাম। মোটামুটি এই আমার পরিচয়, এর মধ্যে মিথ্যে একটুও নেই।

কথাগুলি বলার এমন একটি সরল আবেদন যে, যে ক্রোধ মনের মধ্যে নিয়ে এককড়ি এখানে এসেছিল তার অনেকখানিই শান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে হ'লো এই প্রসঙ্গে সদয়-কণ্ঠে একটু আলাপ করে, কিন্তু তাও পারলে না, জলধির অভিযোগ বাধা দিলে। তাই বলি-বলি করেও শেষে চুপ করেই বসে রইলো।

মণি প্রশ্ন করলে, আজকের অধিবেশনের কি হ'লো এককড়িদা ?

অধিবেশন হয়নি। স্থগিত রইলো।

কেন ? আমি না যাবার জন্যে নয় ত ?

কতকটা তাই বটে। আজ কি তুমি খুব অসুস্থ ?

না, ঠাণ্ডা লেগে সামান্য একটু জ্বরের মতো হয়েচে, অনায়াসে যেতে পারতাম জলধিবাবু বারণ না করলে। বললেন, আটকাবে না, আজকের দিনটা তিনি বেশ চালিয়ে নিতে পারবেন। তাই যাইনি এককড়িদা।

শুনে এককড়ি ভারী বিস্মিত হ'লো ; জিজ্ঞাসা করলে, জলধি কি তোমাকে যেতে বারণ করেছিলো ?

হাঁ, বারণই ত করলেন। একটু থেমে মণি বললে, অথচ এমন দিন গেছে যখন সত্যিই বড় অসুস্থ হয়ে ছুটি চেয়েও পাইনি।

আমাকে জানাও নি কেন ?

মণি চুপ করে রইলো, কিন্তু তার হয়ে জবাব দিলে রমেন। বললে, একটা কারণ বোধ করি এই যে, উপরিওয়ালার বিরুদ্ধে নালিশ করা ও'র স্বভাব নয়।

ও'র স্বভাবের খবর আপনি জানলেন কি করে ?

আবার 'আপনি' দাদা ? বরঞ্চ আর কোথাও উঠে যাবো, তবু বসে বসে আপনার মুখ থেকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুনতে পারবো না।

এককড়ি হেসে বললে, বেশ 'তুমি'ই সই। বল তো রমেন, ওর স্বভাবের পরিচয় তুমি পেলে কি করে ? শুনেছি থাকতে ইউরোপে, বহুদিন কেউ কারও খবর রাখোনি— এই ত সেদিন মাত্র দেশে ফিরেছ।

সবই সত্যি দাদা। তবু আশ্চর্য হয়ে ভাবি, সহসা কেন যে মণি আমার সংবাদ নিতে গেল, আর আমিই বা কেন তেমনি হঠাৎ সব-কিছু পিছনে ফেলে চলে এলাম। কিন্তু সে কথা থাক, আপনার প্রশ্নের জবাব দিই। ছেলেবেলায় ওর আমি মাস্টার ছিলাম। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি, মণি পড়ে আমার দু-ক্লাস নীচে। যে ভদ্রলোকটি আমার ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম যোগাতেন হঠাৎ একদিন তিনি মারা গেলেন।

মণির বাপ আমাকে ডেকে বললেন, সেজন্য ভাবনা নেই রমেন, তুমি আমার মেয়েটিকে ঘণ্টা-খানেক করে পড়িয়ে যেয়ো। দুশ্চিন্তা ঘুচলো, কিন্তু দিন দুই-তিন পড়ানোর পরেই বুঝলাম ওকে আমি পড়াবো বটে, কিন্তু আমাকেও পড়াতে পারে। কামাই করতে শুরু করলাম, যদি বা যাই গল্প করে কাটাই, তবু দেখা গেল পরীক্ষায় মণি প্রথম হয়েছে। মণির বাপের ছিল দেশোদ্ধারের ব্যাধি, বাড়ির কোন খবরই রাখতেন না, অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে ডেকে পিঠ ঠুকে দিলেন, বললেন, আমার মতো কর্তব্যপরায়ণ লোক আর নেই এবং আমার কলেজের অর্ধেক খরচ তিনিই দেবেন। আমার কর্তব্যপরায়ণতার বিবরণ বাপের কাছে মণি কোনদিন বলেনি। এমন কি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ও যখন জলপানি পেলে, তারও অর্ধেক কৃতিত্ব আমার ভাগ্যেই জুটলো। জানিনে কি কারণে বাপের বিশ্বাস ছিল মেয়ের লেখাপড়ার বনেদ আমিই পাকা করে দিয়ে গেছি।

তার পরে?

কার পরে দাদা?

ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাবার পরে মণি কি করলে?

মণি একটা আঙুল তুলে নিঃশব্দে তর্জন করে শেষে মাথা নেড়ে বললে, ও হবে না রমেন। নিজের সম্বন্ধে বলতে চাও বলো, কিন্তু আমার সম্বন্ধে না।

কিন্তু উনি যে মনিব। জানতে চাইলে কি না বলা সাজে?

মনিব আমার, তোমার নয়। আমার কাছে যখন জানতে চাইবেন আমি তার উত্তর দেবো।

এককড়ি প্রশ্ন করলে, বেশ তুমিই বলো। তোমার কাছেই জানতে চাইচি কি করলে তার পরে? কলেজে গিয়ে ভর্তি হলে?

এ কৌতূহলে লাভ কি এককড়িদা? আপনার কাজ ত চালিয়ে দিচ্ছি।

সে অস্বীকার করিনে মণি, বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, আমাদের সঙ্ঘের কাজ অনেক বড় করেই এতদিন চালিয়ে এসেচ। কিন্তু আমাদের সেই সঙ্ঘের প্রয়োজন যদি তোমাতে শেষ হয়ে থাকে আর কোন একটা উপায় করে ত দিতে পারি। কিছু একটা তোমার ত করা চাই।

জীবিকার জন্য বলছেন?

ধরো তাই।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলো। শেষে মণি জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি আর চান না?

জলধি চায় না। সে বলে তুমি থাকলে কল্যাণ-সঙ্ঘের নাম পালটে দিতে হবে।

বুঝেচি। কিন্তু আপনি নিজে কি বলেন?

এখনও বলিনি কিছুই। জানি, জলধির অনেক দোষ, তবুও জানি স্বদেশসেবার

জমা-খরচের খাতায় তার খরচ বাদেও বাকী যেটা আছে সেও অনেক। তার মতো স্বার্থ ত্যাগ করেছে ক'জন? কত লোকে তার মতো দুঃখ ভোগ করেছে? তাকে বাদ দিলে সঙ্ঘ আমার টিঁকবে না।

ওঁকে বাদ না দিয়েও সঙ্ঘ আপনার টিঁকবে না এককড়িদা।

এককড়ি মুখ ফিরিয়ে রমেনের প্রতি খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, তুমি কি করে জানলে রমেন?

জানিনে, শুধু আমার অনুমান। জলধিবাবু যাই হোন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্তা আপনি! কিন্তু, একটা কথা বলি এককড়িদা, পারা-আঁচড়ানো আরশিতে মুখ দেখে যে মুখের বিচার করবে, সে সুবিচার করে না। ভাবে, মুখের ঐ ক্ষতচিহ্নগুলোই সত্যি। আপনারও হয়েচে সেই দশা। সঙ্ঘের অশুভ কামনা করিনে, কিন্তু উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক, মনে হচ্ছে এ টিঁকবে না।' কিন্তু মণি, তুমি বিষণ্ণ হয়ে উঠলে কেন, এ ত তোমাকে মানাচ্চে না!

মণি একটুখানি ম্লান হেসে বললে, আমার প্ল্যানটা যে ফেঁসে গেল।

এককড়ি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের প্ল্যান মণি?

মণি একবার দ্বিধা করলে, হয়ত ভাবলে বলা উচিত কি না, কিন্তু এককড়ি তেমনি আগ্রহে চেয়ে আছে দেখে আস্তে আস্তে বললে, একটু পূর্বেই ভাবছিলাম আপনার কাছে হাজার-খানেক টাকা ধার চেয়ে নেবো।

এককড়ি ক্ষণমাত্রও দ্বিধা না করে বললে, বেশ ত, তাই নিয়ো।

রমেন জিজ্ঞাসা করলে, চাকরি ত গেল, শোধ দেবে কি করে?

এককড়ি বলল, সে ও-ই জানে। আমি জানি ও যেখানেই থাক, বেঁচে থাকলে শোধ দেবেই। আর মরে যদি যায় সে এতবড় ক্ষতি যে, হাজার টাকার শোক আমার মনেও পড়বে না। টাকাটা তোমাকে আমি কালই পাঠিয়ে দেবো।

রমেন বললে, কিসের প্রয়োজন তা-ও জিজ্ঞাসা করবেন না?

না। আমি জানি ও অপব্যয় করে না। কিন্তু এখন উঠি। সঙ্ঘের তরফ থেকে তোমাকে সাধুবাদ দেওয়া চলে না, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ রইলো। যদি কখনও তোমার উপকারে আসতে পারি আন্তরিক খুশি হবো—এই বলে এককড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রমেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় শুধু ঘণ্টা-খানেকের, আর কখনও আলাপ করবার সুযোগ হবে কি না জানিনে, কিন্তু এটুকু জেনে গেলাম যে আমার সম্বন্ধে ধারণা তোমার খুব খারাপ হয়েই রইলো।

রমেন হেসে বললে, তাতে আপনার ক্ষতি হবে না দাদা। কিন্তু এ কথাটা বলাই ভাল যে, রুগী যখন মরে তখন আড়ালে ডাক্তারের বাপান্ত করা ছাড়া গৃহস্থের আর কোন সান্ত্বনাই থাকে না।

এককড়িও হাসলে এবং উভয়কেই নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। মণিমালাকে আজ সে প্রথম নমস্কার করলে। আর কোনদিন করেনি।

মিনিট পাঁচ-ছয় ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে রইলো।

মণি বললে, কি রমেন, এবার বাপান্ত শুরু করবে নাকি?

রমেন বললে, সে নেপথ্যে। তবে প্রত্যক্ষে বলার আজ এইটে পেলাম যে, এতকাল রমেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল তাঁর চেয়ে মহাশয় ব্যক্তি ভূ-ভারতে নেই। এতদিনে সেই অহঙ্কারটা চূর্ণ হ'লো।

হ'লো ত?

হ্যাঁ। আর একটা কথা বলবো? ভয়ে, না নির্ভয়ে?

নির্ভয়েই বলো।

দাদার একটু বয়স হয়েছে, বেশ মানাবে, না—কিন্তু সংসারে মণিমালার বর যদি কেউ থাকে ত এই ব্যক্তি।

মণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, আহা রমেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

পড়তেও পারে গো বন্ধু, পড়তেও পারে। কিন্তু আর না, উঠি। রাস্তায় একলা ঘুরে ফিরে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই গে। নইলে সারারাত ঘুম হবে না। এই বলে সে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো। দোর পর্যন্ত এগিয়ে ফিরে চেয়ে বললে, তোমার সতীলক্ষ্মী বিদুষী বান্ধবীদের একবার দেখাতে পারো না মণি?

পারি, কিন্তু কি হবে?

একটু বাজিয়ে দেখবো।

সর্বনাশ! তুমি কি তাদের বিদ্যের পরীক্ষা নেবে নাকি?

ওগো না না। তোমাদের ও-দিকটা আমার জানা আছে, তুমি, নিঃশঙ্ক হও। দীর্ঘদিন দেশছাড়া, ইতিমধ্যে দেশের মেয়েদের বহু পরিবর্তন, অর্থাৎ বহু উন্নতি ঘটেছে, এমনি একটি জনশ্রুতি বিদেশ থেকেই কানে পেঁছেছে। শানে আছড়ালে তাঁরা কিরকম আওয়াজ দেন, অর্থাৎ খাদটা কি পরিমাণে মিশেছে দেখতে একটু সাধ হয় মণি।

তাঁরা তোমাকেও ত আছড়াতে পারেন?

তা-ও পারেন, বিচিত্র নয়।—এই বলে রমেন হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে এককড়ি একমনে লিখে যাচ্ছে। এক পাশে গুড়গুড়ির কলকেটা বৃথা পুড়ছে, হাতের কাছে নলটা অনাদরে পড়ে, টেনে নেবার সময় হয়নি, চায়ের বাটিটা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেলো, মুখে তোলবার ফুরসত পায়নি, এমনি সময়ে জলধি এসে উপস্থিত। মিনিট পাঁচ-ছয় চুপচাপ বসে থেকে বললে, এককড়িদা, আপনার অভিনিবেশটা একটু বিচলিত করতে চাই। বড় দরকার।

এককড়ি মুখ না তুলেই বললে, বলো।

কি এত লিখছেন ?

আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের আইন-কানুনগুলোর কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তারই একটা খসড়া করচি।

করুন। পরিবর্তন আবশ্যক হয়েছে নিশ্চিত। Rather overdue

হুঁ, বলে এককড়ি লেখায় মন দিলে।

আবার মিনিট পাঁচ-ছয় নীরবে কাটলো। জলধি বললে, অন্য সব-কিছু তাচ্ছিল্য করা যেতেও পারে, কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্রটা নয়। কারণ, সুনাম যদি ঘোচে, হাজার চেষ্টাতেও সঙ্ঘকে আমরা খাড়া রাখতে পারবো না, কাত হয়ে পড়বেই। এখানে আমাদের শক্ত হতে হবে।

নিশ্চয়।

এই দুটো দিন আমি অনেক ভেবেচি এককড়িদা। কষ্ট খুবই হয়, কারণ এই ওর জীবিকা। শুনেচি কে একজন অন্ধ আত্মীয়কেও মণি প্রতিপালন করে। তবু মণিকে রাখা চলবে না, বিদায় দিতেই হবে। জানি আপনার মন ভারী নরম, কিন্তু এ এতবড় serious matter যে, আপনাকে দুর্বল হতে আমি কিছুতেই দিতে পারবো না।

এককড়ি কলম রেখে উঠে বসলো। চামড়ার কালো পোর্টফোলিওটা কোলে তুলে নিয়ে খুঁজে খুঁজে একখানা কাগজ বার করে জলধির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, গুড়গুড়ির নলটা মুখে নিয়ে নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলো।

কাগজখানা পড়তে পড়তে জলধির মুখ পাংশু হয়ে গেল। শেষ করে বললে, মণিকে জবাব দেবার পূর্বে একবার আমাকে জানালেন না কেন ?

এককড়ি মুখের নলটা সরিয়ে রেখে বললে, এইমাত্র ত তুমি নিজেই বলছ আমাদের শক্ত হতে হবে, মণিকে রাখা চলবে না। তা ছাড়া কোথায় তুমি ছিলে হে ? তিনদিন এলে না, এলে কথাটা নিশ্চয়ই শুনতে পেতে। আর যাকে সরাতেই হবে তাকে শীঘ্র সরানোই ভাল। অবিচার করিনি, তিন মাসের মাইনে বেশী দিয়ে দিয়েচি। এই দেখ রসিদ।—এই বলে এক টুকরো টিকিট-মারা কাগজ জলধির সামনে এগিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, শুনলাম সেও বাড়িআলাকে নোটিশ দিয়েচে। লোকটা ভাল, পনরো দিনের কড়ারেই রাজী হয়েচে, একমাসের নোটিশ দাবী করেনি।

জলধি তিক্তকণ্ঠে বললে, হাঁ, মহাশয় ব্যক্তি। মণি কোথায় যাবে কিছু জানিয়েছে ?

না বলছে চিঠি লিখে পরে জানাবে।

তাকে জবাব দিলেন আপনি, কিন্তু আমার নাম করতে গেলেন কেন ?

বেশ কথা! তুমি সেক্রেটারী, তোমার ঘোরতর আপত্তি তাকে না জানিয়ে চলে ?

শুধু আমার আপত্তি, আপনার নয় ?

নিশ্চয়!

জানিয়েছেন তাকে?

নিশ্চয় জানিয়েছি।

জলধির মুখে আর কথা জোগালো না, শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

এককড়ি খসড়ার কাগজগুলো একে একে গুছিয়ে নিয়ে জলধির পানে এগিয়ে দিলে, বললে, পড়ে দেখ।

লেখা শেষ হোক না দাদা, ঢের সময় আছে।

তার ঔদাসীন্যে এককড়ি বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললে কোথায় ঢের সময়। ছাপতে হবে যেখানে যত মেম্বার আছে সারকুলেট করতে হবে।—গড়িমসির ত কাজ নয়। এই দিকটায় আমার চোখ খুলে দিয়ে তুমি মস্ত কাজ করেছ, জলধি। 'সত্যিই ত। চরিত্রই যদি না রইলো ত রইলো কি? সঙ্ঘ দাঁড়াবে কিসের' পরে? এখন থেকে এই সুনামই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় asset —সত্যিকার মূলধন। সঙ্ঘ-সংক্রান্ত যে যেখানে আছে—পেড্ বা আনপেড্—সকলেই বুঝবে এদিকে সেক্রেটারীর লেশমাত্র গাফিলতি নেই। সে মণির মতো কাজের লোককেও বিদায় দিতে একমুহূর্ত বিলম্ব করেনি। আমি তোমাকে congratulate করি জলধি।

জলধি অন্তরে জ্বলে গিয়ে বললে, আপনার ইচ্ছেটা কি মণির ব্যাপার আমরা ঢাক পিটে সর্বত্র প্রচার করি?

তা না হোক, কিন্তু দলের লোকে তা জানবেই, চাপা দেবে কি করে, আর দিয়েই বা লাভ হবে কি?

অর্থাৎ কল্যাণ সঙ্ঘের পক্ষে থেকে মণিমালার এই হবে বিদায় অভিনন্দন! না দাদা, মাপ করুন, রাজী হতে পারলাম না। আর কিছু না মনে করি, সঙ্ঘের কল্যাণে এই তিনটে বছর তার অবিশ্রান্ত খাটুনি ভুলতে পারবো না।

ভোলার কথা নয় হে জলধি, কিন্তু উপায় কি? আমাদের কাগজপত্রে মণির বদলে অজয়ের দস্তখত দেখলে দলের লোকে কারণটা জানতে চাইবেই, তখন ঢাকবে কি দাদা।

এককড়ি বললে, সেই ত মণির জায়গায় কাজ করবে। Economics-এ এম. এ, একটুর জন্যে first class টা গেছে, নইলে যে-কোন কলেজে দেড় শ' টাকা তার ঘোচায় কে? মাইনে বাড়াতে হয়নি,—পঞ্চাশ টাকাতেই রাজী হ'লো। কুড়িয়ে পাওয়া বললেই হয়।

জলধির রাগের সীমা রইলো না, কিন্তু যথাসাধ্য চেপে প্রশ্ন করলে - রত্নটি কুড়িয়ে পেলেন কখন?

আজ সকালেই। অজয়ের বাপের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল, বছর-খানেক ধরে সে ছেলের জন্যে একটা সুপারিশ-চিঠি চাইছিল আমার ওপরে: নানা কারণে দিতে পারিনি, তাই—

তাই মামার দায় আমার কাঁধে চাপালেন ?

না হে না। সে কাল থেকে যখন অফিসের ভার নেবে, তার কাজ দেখে তুমি খুশী হবে। মণির চেয়ে অযোগ্য হবে না বলে দিলাম।

জলধি আর তর্ক করলে না। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, আসলে আপনার প্রকৃতিটা বড় নির্মম, এককড়িদা। আমি নিজে যদি কখনো বিদায় নিই, কেবল এই জন্যেই নেবো। ইতিমধ্যে আপনার গণেশের কলম চলতে থাক্, আমি উঠলাম। এই বলে সে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এককড়ি ডেকে বললে, কোথায় যাচ্ছ জলধি ?

যাবার মুখ নেই, তবু যেতে হবে। পুরুষত্ব বলুন, মনুষ্যত্ব বলুন, দেশের পায়ে আজো একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারিনি। মায়া-মমতা আজও যেন বুকের মধ্যে কোথায় বেঁধে, এককড়িদা।

অর্থাৎ মণির বাসায় গিয়ে তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চাও ?

সান্ত্বনা দেবার দরকার হবে না, এটুকু অন্ততঃ তারে জানি। সে যাই হোক, আমি হলে কিন্তু এমন সরাসরি জবাব দিতাম না,—এবারের মত শুধু একটা warning দিয়েই পালা শেষ করতাম।

শুনে এককড়ি প্রথমটা গম্ভীর হ'লো, তার পরে হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, দূরে গাধা! তোর পালা আরম্ভ করার বুদ্ধিটাও যেমন অসাধারণ, পালা শেষ করার ফন্দিটাও তেমনি চমৎকার। এই warning দেবার মতলব কে যোগালেন ? এই বুঝি তারে চিনেচিস্ এতদিন একসঙ্গে কাজ করে ?

জলধি তিরস্কারের উত্তর খুঁজে না পেয়ে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইলো।

এককড়ি বলতে লাগলো, তার আচরণ আমরা অনুমোদন করিনে, এই ধরনের স্বেচ্ছাচার আমাদের ভাল লাগে না। অতএব বিদায় দেওয়া হ'লো এ কথাটা মণি অনায়াসে বুঝবে, কিন্তু তোর চোখ রাঙিয়ে ধমক দেওয়া বুঝবে না। বরঞ্চ, এইজন্যে সে কৃতজ্ঞ থাকবে যে, আমরা তার সংস্রব ত্যাগ করেচি, কিন্তু অসম্মান করিনি। বলিনি, প্রভুর রুচির সঙ্গে ভৃত্যের রুচি মেলেনি বলে এবার শুধু তার কান মলে দেওয়া হ'লো, ভবিষ্যতে নাক কেটে দেওয়া হবে।

জলধি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে ব্যাপারটা একেবারে settled ? এর নড়চড় হতে পারবে না ?

না। কল্যাণ-সংঘের নামটা তার জন্যে পাল্টাতে পারবো না।

জবাব শুনে জলধি বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে নতমুখে বসে রইলো ; তার পরে মুখ তুলে অনুতপ্ত স্বরে ধীরে ধীরে বললে—এবারের মতো আমার অভিযোগটা আমি প্রত্যাহার করচি এককড়িদা। এবার তাকে আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

এককড়ি ঘাড় নেড়ে বললে, আমি প্রস্তুত নই জলধি।

কিন্তু সত্যই সে কোন অপরাধ করেছে কি না তাও বিচার করবেন না ?

সত্যিকার অপরাধ তুই কারে বলিস জলধি। যা ইঙ্গিত করেছিল তা-ই ?—না সে দোষ সে কখনো করেনি, কখনো করবে না।

তবু বিদায় করে দেবেন ?

হাঁ তবুও। আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে পারবো না!

কতখানি বিপদের মধ্যে তাকে ঠেলে দিচ্ছেন একবার তাও চিন্তা করবেন না ?

সে চিন্তায় লাভ ? বিপদকে সে ভয় করে নাকি ? তোর হলে চিন্তা করতাম। এই বলে এককড়ি একটু হেসে গুড়গুড়ির নলটা তুলে নিয়ে মুখে দিলে।

জলধি গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চললাম।

এককড়ি তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে আবার একটু হেসে বললে, কাল একবার আসিস। বুঝেচি, তোর আসল মতলব ছিল মণিকে ধমকানো,—জবাব দেওয়া নয়। যখন সেখানে যাচ্ছিস, তখন কথা উঠলে বলিস, জবাব তাকে আমি দিয়েছি—তুই নয়, তুই বরঞ্চ তাকে রাখতেই চেয়েছিলি।

জলধি ভেবে পেলে না কথাটা তামাশা, না আর কিছু। অন্তরে মর্মান্তিক জ্বলে গেল, কিন্তু প্রকাশ না করে শুধু বললে, অত্যান্ত বাহুল্য কথা এককড়িদা। জবাব দেবার সত্যিকার মালিক যে তুমি, আমি নয়, এ কথা সে জানে। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোরের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তবু সেই বাহুল্য কথাটাই বলার জন্যে একবার তার বাসায় যেতে হবে। আমার সম্বন্ধে মণি আর যাই মনে করুক, এ না মনে করে এক অভাগা আর এক অভাগার অন্ন মেরে দিলে। এই বলেই দ্রুতবেগে চলে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওদিকে মণিমালার ঘর থেকে এইমাত্র গুটি-চারেক মেয়ে নেবে গেল। তারা মণির বন্ধু। এসেছিল নারী সমিতির পক্ষ থেকে। আগামী সপ্তাহে বসবে অধিবেশন, ডেলিগেট আসচেন নানা জেলা থেকে প্রায় শতাধিক, প্রস্তাব এই যে উক্ত সভায় মণিমালাকে মুভ করতে হবে একটা omnibus resolution—তাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ থেকে চাকরিতে নর-নারীর সমান মাইনে পর্যন্ত নানা দাবীই বেশ কড়া ক'রে থাকবে। মণি কিন্তু রাজী হ'লো না, হেসে বললে, যে চেহারা ভাই আমার—কেউ বিয়ে করলেই বেঁচে যাই, তা আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ। এনা হেনা দুই বোন, তাদের ঝাঁজই সবচেয়ে প্রখর, রেগে বললে, বিয়ে কি আমাদেরই হয়েছে নাকি ? আমরা নিজেদের কথা ত ভাবছি না, ভাবছি সমস্ত নারী জাতির হয়ে। তুমি বলতে পারো চমৎকার, ডিবেট করতে তোমার জোড়া নেই, তাই সুকল্যাণী মিটারের ইচ্ছে এ resolution তোমাকে দিয়েই প্রস্তাবিত করা। আমরা ফিরে আসছি তাঁর চিঠি নিয়ে, দেখি কি করে তখন অস্বীকার করো।

মণি বললে, আমাকে মাপ করো ভাই।

এনা বললে, জানো এতে তাঁকে অপমান করা হবে।

অপমান ত করচি নে ভাই, আমি হাতজোড় করছি।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আসছি চিঠি নিয়ে। হয়ত বা তিনি নিজেই এসে হাজির হবেন। এই বলে মেয়েরা চলে গেল। তাদের কাপড়ের এসেন্সের গন্ধে তখনও ঘরের বাতাস ভারী. উত্তেজিত কণ্ঠের ঝাঁঝালো তর্ক তখনও চারটে দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছে। মণি ডাকলে, রমেন কি ঘুমুচ্ছো ?

ঘরের অপর প্রান্তে একটি কেম্বিসের ইজিচেয়ারে রমেন চোখ বুজে শুয়েছিল, সাড়া দিয়ে বললে, না, আমার ট্রেনের-শব্দেই ঘুম হয় না, ত চার-চারটে এরোপ্লেনের সার্কাস চলছিল।

তুমি ভারী অসভ্য, রমেন। মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও কি শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা কইতে পারো না ?

রমেন চুপ করে রইলো। মণি বলতে লাগলো, আমি আশা করেছিলাম আমাদের আলোচনায় তুমি যোগ দেবে, কিন্তু একটা কথা কইলে না, ওধারে গিয়ে শুয়ে রইলে। তোমার সম্বন্ধে ও'রা কি ভেবে গেলেন কল্পনা করতে পারো ?

না।

ভেবে গেলেন একটি আস্ত জানোয়ার। ভেবে গেলেন এ পশুটাকে মণি যখন-তখন তার ঘরের মধ্যে সহ্য করে কি করে !

উঃ—

কিসের উঃ—?

ধরো, এই মেয়ে চারটির যদি কোনদিন বিয়ে হয় ! উঃ—

মণি রেগে বললে, বিয়ে ত হবেই একদিন। ও'রা কি চিরকাল আইবুড়ো থাকবেন নাকি ?

রমেন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলে. সে মতলব এ'দের নেই তা হলে ? ঠিক জানো ?

মণি হেসে বললে, না নেই। ঠিক জানি।

উঃ—

তোমার বুকে কি শেল বি'ধছে নাকি ?

হাঁ বি'ধছে। মানস-চক্ষে আমি সেই দুর্ভাগাগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে, জানো মণিমালা, পরম জ্ঞানী Aristotle সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। কোথায় যেতে পথের ধারে একটা গাছের ডালে দেখতে পান, একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, আহা, এমনি ফল যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছের ডালে ফলতো, জগৎ স্বর্গ হয়ে যেত। ত্রিবিধ দুঃখ-নাশের মীমাংসা বুদ্ধদেব দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু দুনিয়াকে স্বর্গ করবার থিওরি একমাত্র তিনিই আবিষ্কার করে গেছেন। হাঁ, জ্ঞানী বটে !

রমেন ভেবেছিল, মণি খুব একচোট হাসবে, কিন্তু হ'ল উলটো। দেখতে দেখতে তার মুখের চেহারা কঠোর হয়ে এলো, শান্ত গম্ভীর-স্বরে বললে, রমেন, তোমার এই

কথাটা আমি চিরদিন মনে রাখবো।

রমেন অপ্রতিভ হয়ে বললে, কথা ত আমার নয় মণি, এরিস্টটলের। তা-ও সত্যি কি বানানো তা-ই বা কে জানে।

না, সত্যি। তাও শুধু তাঁরই নয়, সমস্ত পুরুষের মুখেরই এই এক কথা। সেই বুড়ো Aristotle আজও আড়াই হাজার বছর পরে তোমার মধ্যে বেঁচে আছে। সে আছে জলধির মধ্যে, সে আছে এককড়িদা'র ভিতরে। তাই ত গেল আমার চাকরি। তিন বছরের রাত্রিদিনের সেবা একমুহূর্তের ভর সইলো না। তুমি নিজে মনিব হলেও আমার চাকরি ঠিক এমনি করেই যেতো, রমেন।

রমেন ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, আমি মনিব যখন নয়, তখন সে প্রমাণ দিতে পারলাম না। কিন্তু তুমি মিথ্যে তিলকে তাল করছো, মণি। বুড়োর তামাশাটা সত্যি হলে কি মানুষ আজও বেঁচে থাকতো! কোন্ কালে নিঃশেষ হয়ে যেতো।

নিঃশেষ না হবার অন্য হেতু আছে, রমেন। কারণ মানুষকে রাখার ভার পুরুষের 'পরে নেই, সে আছে আর একজনের' পরে। তাই ত দেখি নরনারী এতকাল একসঙ্গে থেকেও আজও সন্ধির একটা ফরমুলা খুঁজে পেল না, কোন্ পথে দুঃখের নিরসন, সে দিকটাই তাদের চোখে পড়লো না, চিরদিন কানা হয়ে রইলো।

রমেন আস্তে আস্তে বললে, মণি, কেন জানিনে, কিন্তু মনে হচ্ছে আজ তোমার মনটা অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে।

উদ্‌ভ্রান্ত? হতে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্নের হঠাৎ জবাব পেয়ে গেলাম! ভেবেছিলাম ওদের অনুরোধ শুনবো না, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব আমার মুখ দিয়ে বার হবে না, কিন্তু এখন স্থির করলাম, এ প্রস্তাব আমি নিজেই আনবো।

রমেন একটু হেসে বললে, সে না হয় করলে, কিন্তু জিনিসটা ভাল কি মন্দ, মানুষের অভিজ্ঞতায় এর দাম কি নির্দিষ্ট হয়েছে, তার কি জ্ঞান তোমার আছে মণি?

মণি বললে, কোন জ্ঞানই নেই,—ইতিহাস ত জানিনে. আর যেটুকু আছে সে-ও তুমি ইচ্ছে করলে খণ্ড খণ্ড করে দিতে পারো, কিন্তু তোমার কথা আমি শুনবো না। বরঞ্চ এই কথাই জোর করে বলবো, আমার অন্তরের সত্য অনুভূতি আমাকে সত্য পথ দেখিয়ে দেবে।

সত্য অনুভূতি পেলে কখন?

এইমাত্র। তুমি পরিহাসের ছলে যা বললে তার মধ্যে।

সে কি কখনো হয়?

হয় রমেন, হয়। গল্প শোনোনি, আমাদের লালাবাবু মেছুনির মুখের একটা উড়ো কথা শুনে সংসারত্যাগ করে গিয়েছিলেন। অথচ কত লোক ত দিন-রাত শোনে, তারা কি ঘরদোর ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়? কিন্তু যে শুনতে পায় সে-ই শুনতে পায়।

মণি, তুমি যে এতবড় পাগল আমার ধারণা ছিল না।

মণি হেসে বললে, পাগলই ত। নইলে কি দেশের জন্যে জেল খাটতে যেতে পারতাম? প্রাণ দিতেও রাজী ছিলাম। তুমি পারো?

সে পরীক্ষা ত আমাকে দিতে হয়নি,মণি।

পরীক্ষা দেবার দিন যদি আসে পারবে দিতে?

রমেন হঠাৎ এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলে না। এমনি সময়ে দোরের বাইরে থেকে ডাক এল, মনি, আসতে পারি কি?

মণি চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে দরজার দিকে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না।

কিন্তু এ-কার কণ্ঠস্বর বুঝতে ভুল হয়নি এতটুকুও। মুখে খুশীর ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে ব্যস্ত-পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। উঁকি দিয়ে দেখে জলধি দাঁড়িয়ে।

মণি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললে—আরে জলধিবাবু যে।

বিশেষ দরকারে আবার ছুটে আসতেই হ'ল মণি।

বেশ ত! দরকার হলে একবার কেন, হাজারবার আসবেন জলধিবাবু।

জলধি ছোট্ট করে হেসে বললে, এখানেই দাঁড় করিয়ে—

মণি লজ্জিত হয়ে বললে—সে কি কথা জলধিবাবু! আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

মণির কথায় জলধি গুটিগুটি ঘরে ঢুকে গেল।

মণি একটা হাতল ভাঙা চেয়ার টেনে জলধির দিকে এগিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললে, বসুন জলধিবাবু।

জলধি চেয়ার দখল করে মুহূর্তের জন্য রমেনের দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই মণির দৃষ্টি ফিরাল। মণির দিকে তাকাল।

মণি মুখের হাসিটুকু বজায় রেখেই বললে, আপনি আসবেন আমি কিন্তু জানতুম জলধিবাবু।

তুমি জানতে? . কি করে?

এক সঙ্গে এতদিন কাটালাম, আপনাকে চিনতে পারি নি?

জলধি ম্লান হাসল।

মণি ব'লে চলল, অবশ্য আপনি না এলে হয়ত আমি নিজেই আপনার খোঁজে যেতুম জলধিবাবু।

তাই নাকি? হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল, বল ত? খুবই জরুরী দরকার কি?

মণি নির্বাক।

জলধি বলে চলল, কিন্তু আমার ত মনে হয় না তেমন কোন জরুরী দরকার আছে তা তোমার দরকার থাকলেও থাকতে পারে।

শুধুই আমার দরকার জলধিবাবু? আপনার কোনই দরকার নেই।

আমার কোনই দরকারই নেই মণি। আমার আর কি-ই বা দরকার থাকতে পারে?

মণি মুচকি হেসে বললে, তবে যে—

তার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে জলধি ব'লে উঠলে, যাচ্ছিলুম এপথ দিয়ে। ভাবলুম, একবারটি উঁকি দিয়ে যাই, এই আর কি। তা তোমাদের বাক্যালাপে একটু ব্যাঘাত ঘটালুম, তাই না ?

মণি চোখে-মুখে আকস্মিক গাম্ভীর্যের ছাপ এঁকে বললে—এতই যদি ভেবেছেন জলধিবাবু তবে আর মিছিমিছি—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জলধি মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললে, সত্যি মণি তুমি একেবারেই ছেলে মানুষ রয়ে গেছ দেখছি! হেঁয়ালিও বুঝ না, রসিকতারও কোন স্থান তোমার মধ্যে নেই।

রমেন দরজায় জলধির উপস্থিতি বুঝতে পেরেই একটা মাসিক পত্রিকা মুখের সামনে মেলে ধরে তার কাছ থেকে নিজেকে স'রিয়ে রেখেছে। সে-ত ভালই জানে লোকটা শয়তানের শিরমণি। ভেঁজাবেড়াল। ভাঁজা মাছটা পর্যন্ত উল্টে খেতে জানে না। ঐসব লোকের সংস্রব যত এড়িয়ে চলা যায় ততই মঙ্গল। সব চেয়ে বড় কথা রীতিমত বাক্যবাগিশ। কথার মারপ্যাঁচ খুবই জানে। মুখ ফসকে কখন কোন কথা বেরিয়ে যাবে একেবারে পরমাদ ঘটিয়ে ছাড়বে। তার চেয়ে বরং নির্লিপ্ত থাকা অনেক ভাল। বোবার শত্রু নেই।

জলধি নীরব চাহনি মেলে একবার ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, মণি তোমার ঘরটাকে কিন্তু ভারী সুন্দর করে সাজিয়েছ! যাকে বলে একেবারে ছিমছাম। সবকিছুর মধ্যেই রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঃ চমৎকার সাজিয়েছ!

মণি নীরবে ছোট্ট করে হাসল।

জলধি বলল, দামী আসবাবপত্র কিছু নেই, জৌলুসের প্রাচুর্য নেই—সুরুচির পরিচয় বহন করছে।

মণি বুঝতে পারছে জলধি তার রুচিবোধের প্রশংসা করতে অসময়ে একটা পথ ছুটে আসে নি। নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা বলতে এসেছে যা তার পক্ষে সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুচতুর লোকেরা যা করে, আশপাশ দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ নিয়ে তবেই মূল প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। মণি মূল প্রসঙ্গে খোঁজ বরাবার চেষ্টা করল, জলধিবাবু, আপনি হয়ত জানেন না, কয়েকদিনের মধ্যে এ ঘর আমি ছেড়ে দিচ্ছি। অতএব এর প্রশংসা করে সময় নষ্ট করা কি নিরর্থক নয়, আপনার অমূল্য সময়ের অপচয়ও ত—

জলধি যেন অকস্মাৎ হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে সে এতক্ষণ ইতস্তত করছিল মণি তাকে সে-সুযোগ হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ম্লান হেসে মণির দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিলে, মণি একটা কথা—

বলুন জলধিবাবু, কি কথা ? এত ইতস্ততের কি আছে বুঝছি না ত!

জলধি বার কয়েক ঢোক গিলে, হাত কচলে আড়ষ্ট ভাবটা একটু কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে কোনরকমে উচ্চারণ করলে—মণি তোমার চাকরিটা কিন্তু আমি খাইনি।

মণি মুচকি হেসে নীরব চাহনি মেলে জলধির দিকে তাকিয়ে রইল।

জলধি এবার বললে, বিশ্বাস কর মণি, তোমার চাকরি খাওয়ার ব্যাপারে আমার এতটুকুও উৎসাহ ছিল না।

মণি ম্লান হেসে বললে, আপনি নিজেকে অপরাধী ভেবে কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন জলধিবাবু!

কষ্ট পাব না, তুমি এটা বলছ কি মণি। আমি কিছু জানলাম না শুনলাম না অথচ তোমার চাকরি যাওয়ার দায় ভার যদি আমাকে বইতে হয় ব্যাপারটা যেমন দুঃখদায়ক তেমন অসহনীয়ও বটে।

মণি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু অক্ষুন্ন রেখেই বললে, জলধিবাবু, চাকরিটা গেছে এটাই বড় কথা। কার জন্য গেছে, কেনই বা গেছে তার খোঁজ না-ই বা করলাম।

সে কী কথা মণি! এককড়িদা আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজে ধোয়া তুলসিপাতা সেজে রইবেন এটাও ত মেনে নেয়া যায় না!

মণি ম্লান হেসে বললে, কিন্তু জলধিবাবু আপনার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে এককড়িদা নিজেকে —

তার কথা শেষ করতে না দিয়েই জলধি বলে উঠলে, এককড়িদাকে তুমি চেন না মণি লোকটা একবারে ছুঁচোর হদ্দ। দয়া মায়া-মমতা ত নেই-ই; এমন কি এতটুকু বিচার-বিবেচনাবোধ পর্যন্ত নেই নির্মম পাষণ্ডটার।

মণি নরম গলায় বললে—এসব কথার এখন আর কতটুকু মূল্য আছে জলধিবাবু? আজ এসব প্রসঙ্গ অবান্তরই শুধু নয়, নিরর্থকও বটে।

জলধি বেশ একটু চড়া গলায়ই উচ্চারণ করলে, অবান্তর। এ তুমি বলছ কি মণি! কথা নেই বার্তা নেই হুট করে একটা লোককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবে! এ কী ছেলে-খেলা নাকি! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মণি, এককড়িদা স্বেচ্ছাচারী উন্মাদের মত কাজটা করেছে। মণির দিকে আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে জলধি আবার বলতে লাগলে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া এককড়িদার একটা বড় দোষ! আরে বাবা, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখ, তারপর না হয় চাকরি খা, কি ফাঁসিকাঠে ঝোলা। তা না করে কেউ বললেই হ'ল চিলে কান নিয়ে গেছে, ব্যস অমনি চিলের পিছনে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মণি বলে উঠল, কিন্তু চাকরিটা যাওয়াতে আমি খুবই মুষড়ে পড়েছি, এটাই বা আপনি ভাবলেন কি করে জলধিবাবু?

আমি ভালই জানি মণি, মুষড়ে পড়ার মেয়ে তুমি নও। সে ধাতু দিয়ে তুমি—

এসব কথা এখন থাক জলধিবাবু। গতস্য শোচনা নাস্তি। একটা ত মাত্র পেট, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন যা হোক করে যোগাড় করে নিতে পারব, নিজের ওপর এটুকু আস্থা অন্ততঃ রাখি জলধিবাবু। মিছে আমার জন্য ভেবে নিজের মনটাকে বিষিয়ে তুলবেন না, আমার অনুরোধ।

একথা আমার অন্ততঃ অজানা নয় মণি। যে মেয়ের রূপ সৌন্দর্য আছে, বাপ

টাকার কুমীর, তার জন্য ভাববার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু সম্পদ যার অন্তরের অন্তঃস্থলে সংগোপনে লুকানো তার জন্য অন্য কাউকে ভাবতে হয় না। নিজের ভাল-মন্দের ভাবনা নিজেই ভাবতে পারে।

আপনার কথার প্রতিবাদ করে প্রসঙ্গটাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে তোলার ইচ্ছে আমার নেই জলধিবাবু। তবে Aristotle-এর প্রবাদ অনুযায়ী অন্ততঃ গাছের ডালে ঝুলতে যাব না, এটুকু সান্ত্বনা অন্ততঃ নিয়ে যেতে পারেন জলধিবাবু।

জলধি একটু নড়েচড়ে বসল। খোঁচা খোঁচা গোঁফের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট করে হেসে বলল, হ্যাঁ, অ্যারিস্টটল— এর প্রবাদকে অনুসরণ তুমি কখনই করবে না। এ-ক'মাসে তোমার সম্বন্ধে এটুকু ধারণা আমার হয়েছে মণি। কিন্তু এককড়িদা যে কালিদাসের মত যে-ডালে বসে সেই ডালেই অস্ত্র চালাচ্ছেন, এটাও তেমন মিথ্যে নয়! নইলে কার মুখে কি শুনেছেন, ব্যস, পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে দিলে তোমায় চাকরি থেকে একেবারে বরখাস্ত করে! ওনার মত একজন পাকা জহুরির কি করে যে এমন পদস্খলন হ'ল ভেবেই পাচ্ছিনে।

জলধিবাবু যা-ই বলুন না কেন এককড়িদা স্বল্পশিক্ষিত হতে পারেন কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞ মোটেই নন। কল্যাণ-সংঘের স্বার্থে তাঁর পক্ষে হয়ত একথাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তোমার এই একটাই দোষ মণি! যাকে কোন ক্রমে একবার বিশ্বাস করে ফেল তার শত অপরাধও তোমার চোখে কিছুতেই ধরা পড়ে না। আসলে এককড়িদার ভেতরটা বড়ই কঠিন— কঠোর— বড়ই নির্মম। তার ওপর একরোখা ভাবটা ত রয়েছেই। কোনটা সত্যি, আর কোনটা গুজব এটুকু বিচার-বিবেচনা করার মত ধৈর্য ও মানসিকতার বড়ই অভাব তার।

আমি কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই ভাবিত নই জলধিবাবু।

এটা তোমার মহত্ব আর স্বকীয় ঔদার্য গুণে মণি। এককড়িদা কার মুখে কি সব শুনেছেন, ব্যস, অমনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন তোমার বরখাস্তের চিঠি লিখতে। আমি কত করে বললুম, মণি'র সম্বন্ধে যদি কিছু শুনেই থাকেন, উড়ো-কথায় কান না দিয়ে নিজে খোঁজ-খবর নিন। তারপরও যদি ওকে দোষী সাব্যস্ত করেন, ডেকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেখুন কি হয়। বরখাস্তের অস্ত্র ত আপনার হাতেই রইল। প্রয়োজনে যেকোন সময়ই প্রয়োগ করতে পারবেন।

মুখে বিদ্রুপাত্মক হাসি ফুটিয়ে তুলে মণি বললে, আপনি তবে আমার জন্য অনেক লড়েছেন জলধিবাবু।

মণি'র বিদ্রুপটুকু জলধি'র বুঝতে দেরী হয় নি। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, শুধুমাত্র তোমার কথা ভেবে নয় মণি, আমার নিজের কথা ভেবেও এককড়িদা'কে কথাটা আমাকে বলতেই হয়েছে।

আপনার নিজের কথা ভেবে? বুঝলুম না ত জলধিবাবু।

নিজের কথা ভাববার কিছুই নেই বলছ! তুমি মুখে না বললেও নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে, তোমার চাকরি যাওয়ার পিছনে আমারও প্রচ্ছন্ন হাত রয়েছে। আমিই গোপনে তাঁর কান ভারী করে দিয়েছি। আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়েছি, ভাবনি?

মণি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, জানি না জলধিবাবু। ব্যাপারটাকে অত তলিয়ে দেখার মত সময় ও মানসিকতা কোনটাই আমার নেই। আমি শুধুমাত্র এটুকুই বুঝি, এতদিন আমাকে আপনাদের, অর্থাৎ কল্যাণ সঙ্ঘের প্রয়োজন ছিল, আজ সে-প্রয়োজনটুকু মিটে গেছে, বাস, এর বেশী একচুলও ভাবিনি।

এই ত একটা বড ভুল করে বসলে মণি!

ভুল?

হ্যাঁ, ভুল ত অবশ্যই। আপনাদের বলতে ত এর মধ্যে আমাকেও জড়িয়ে ফেললে।

মুচকি হেসে মণি বললে, আমি ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনাদের নয়, এককড়িদার, এবার হ'ল ত?

একটা কথা কি জান মণি? কল্যাণ-সঙ্ঘের তুমিও যেমন কর্মী ছিলে, আমিও তেমনি মাস মাইনের বিনিময়ে কাজ করি। গোঁয়াড় এককড়িদা যাকে বলে একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ। আসলে ওকে কিন্তু এর জন্য পুরোপুরি দোস দেয়া যায় না মণি।

তবে?

দোষ আসলে ওর স্বল্প বিদ্যা আর প্রভূত বিত্ত-সম্পত্তির।

যেমন?

অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত কোন ব্যক্তি যদি ধনকুবের হয় তবে তার মধ্যে একবোখা ভাবটা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। আমাদের এককড়িদা'রও হয়েছে ঠিক তাই। আসল কথা কি জান মণি?'

কি? কি কথা?

আসল কথা হচ্ছে, কল্যাণ-সঙ্ঘ বাদ দিলে এককড়িদা'র আর কি দাম আছে, বলতে পার? একটা কানাকড়িও না অমন টাক ত কতজনারই আছে। কে, কাকে পোছে?

কি জানি, হয়ত আপনার কথাই ঠিক জলধিবাবু।

ঠিক মানে? Hundred percent ঠিক। আর এই যে কল্যাণ-সঙ্ঘের আজ এমন রমরমা অবস্থা, কার দৌলতে? তোমার-আমার মত কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলই ত এই কল্যাণ-সঙ্ঘ। সদস্য আছে, কমিটি বলেও একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে, অস্বীকার করি না মণি।

কেন? আপনি ত কমিটির সেক্রেটারি। মণি বিদ্রূপাত্মক স্বরে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

হ্যাঁ, তা বটে। তবে নাম কো ওয়াস্তে।

মণি অনুযোগ করলে, কেন? একথা বলছেন কেন জলধিবাবু? এককড়িদা ত

আপনার পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও বাড়ান না দেখেছি।

লোক-দেখানো! সবই ওপর-ওপর, লোক-দেখানো ব্যাপার মণি! নইলে এই যে আচমকা তোমাকে ছাঁটাই করে বসল, আমার সঙ্গে ভুলেও একবারটি পরামর্শ করেছেন! জানো মণি, আমি একবারও বলি নি, মণিকে ছাটাই করুন, বা আমার মতামত নিলেন না। অথচ দুম্ করে তোমার চাকরিটা ত খেয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কথায় বলে বিপত্নীপ বন্ধের চেয়ে অকৃতদার যুবক অনেক বেশী নির্ভর যোগ্য।

মণি সবিস্ময়ে জলধির দিকে তাকাল। বাড়ি বয়ে এমন অপ্রাসঙ্গিক কথা, এতে সে মোটেই উৎসাহী নয়। ইচেছ হচেছ, বেশ করে ক'টা কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু নিজের বাড়িতে বসে কাউকে মনে আঘাত দিতে শিক্ষা ও শিষ্টাচারে বাঁধল। তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বললে, জলধিবাবু, আমি ত আগেই বলেছি, চাকরির ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ব্যথা এতটুকুও নেই। এ-মুহূর্তে আমার ভাবনা কি, জানেন?

জলধি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বল্লে, কি? কি ভাবছ মণি?

ভাবছি, স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘ সম্বন্ধে আপনারা কি নতুন কোন চিন্তা করছেন?

যেমন? তোমার কথাটা ঠিক বুঝলুম না মণি।

বলছি, স্বদেশ-কল্যাণ সংঘটা আপনারা কি রাখবেন নাকি তুলেই দেবেন মনস্থ করেছেন?

জলধর একটু নড়েচড়ে বসল। উৎসাহিত হয়ে বল্লে, মণি, ওটা থাকবে কি উঠে যাবে তা এখন সম্পূর্ণ রূপে তোমার ওপরই নির্ভর করছে।

মণি রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লে সে কী কথা জলধিবাবু! এখন ত আর ঐ সংঘের ভাল-মন্দ কোন কিছুর সঙ্গেই আমি জড়িত নই। অতএব ওর অস্তিত্বের সঙ্গে আমার কোন রকম সম্পর্ক যেমন নেই, উঠে গেলেও কিছুমাত্র দায়িত্বও তেমনি নেই।

তবু আমি হলফ করে বলতে পারি মণি, স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যা-ই বল না কেন, সবই তোমার ওপরই নির্ভর করছে।

মণি বাঁকা-চোখে জলধিবাবুর দিকে তাকিয়ে বল্লে, জলধিবাবু, এধরণের কথা বলে আমাকে কিন্তু অহেতুক অপমানই করার চেষ্টা করছেন। আপনি কি এমন কোন অভিলাষ নিয়েই আমার বাড়ি পর্যন্ত ছুটে এসেছেন? আপনাদের কাছে এমন কি অপরাধ করেছি, জানতে পারি?

জলধি হঠাৎ ফুটো বেলুনের মত চিঁপসে গিয়ে বল্লে, অপমান? বাড়ি বয়ে তোমায় অপমান করতে এসেছি মণি! এতক্ষণে তুমি এই বুঝলে মণি!

আপনার কথাবার্তা যে আমাকে এর বেশী ভাবতে উৎসাহিত করছে না জলধিবাবু। কল্যাণ-সঙ্ঘের সঙ্গে আমার সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এ-মুহূর্তে আমার ত মনে হয় এটাই সব চেয়ে বড় কথা। তাছাড়া আর কোন কথা থাকতে পারে ব'লে আমি মনে করি না।

জলধি আমতা আমতা করে বল্‌লে, তোমার মেজাজটা বোধ হয় ভাল নেই মণি। অবশ্য ভাল থাকারও কথা নয়। যাক, কথা বাড়িয়ে আর তোমার বিরক্তির উদ্রেক করার ইচ্ছা মোটেই আমার নেই মণি। চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললে, আমি তবে এখন উঠি মণি। আমি কিন্তু সত্যি তোমায় বিরক্ত করতে আসি নি। বিনা-নোটিশে বাড়ি বয়ে এসে তোমার অমূল্য সময়ের কিছুটা স্বার্থপরের মত ছিনিয়ে নিলুম বলে কিছু মনে কোরো না। যাবার আগে তোমায় আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, তোমার চাকরি খাওয়ার পিছনে আমার কালো-হাত কাজ করেছে যদি ভেবে থাক, আমার প্রতি অবিচারই করা হবে। আর এটাও জেনো, তোমায় চাকরি যিনি দিয়েছিলেন, খেয়েছেনও তিনিই।

মণি নির্বাক রইল। কথা বাড়িয়ে আর অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি করতে চাইল না বলেই মৌনব্রত ধারণ করল।

জলধি ছাতাটা বোগলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত যেতেই রমেন মুখের সামনে থেকে মাসিক-পত্রিকাটা সরিয়ে বললে, জলধিবাবু, চলেই যাচ্ছেন ?

রমেনের ডাকে জলধি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। গোঁফের ফাঁক দিয়ে শুষ্ক হাসি ফুটিয়ে বল্‌লে, প্রয়োজন মিটে গেলে কে আর মিছে বসে থেকে সময় নষ্ট করে মশাই !

সে-ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার ভাবসাব দেখে ত মনে হ'ল না, সময়ের কিছুমাত্র মূল্যও আপনার কাছে আছে।

চোখ দুটো কপালে তুলে জলধি বললে, তার মানে ?

মানেটা খুবই পরিষ্কার নয় কি ? আপনি এখানে আনুমানিক কতক্ষণ হ'ল এসেছেন, বলুন ত ?

একথা বলার অর্থ ?

আপনার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দেব মশাই। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন ত। মুচকি হেসে রমেন বললে।

এরকম একটা অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

রমেন আড় চোখে জলধির দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বললে, প্রশ্নটা করার আগেই আমি কিন্তু ধরেই নিয়েছিলুম, উত্তর আমি পাব না। এখন আমিই আপনাকে সমস্যা মুক্ত করছি, অন্ততঃ দশ মিনিট ধরে আপনি মণির সঙ্গে কথা বলছেন, ঠিক কিনা ?

কি জানি মশাই, হলে হতেও পারে। ঘড়ি ধরে ত আর—

কিন্তু এক মিনিটের কাজ, একটা মাত্র কথা, মণির চাকরি যাওয়ার পিছনে আপনার প্রচ্ছন্ন হাত কাজ করে নি ব্যস, এর বেশী ত কিছু নয়।

আপনি !

গতকাল আপনার সঙ্গে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য বাক্যালাপের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

জলধি এরকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য তৈরী ছিল না। আমতা আমতা

করে বললে হ্যাঁ, কথাটা মণিকে বলা খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল রমেনবাবু। নইলে মণি হয়ত একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে থাকত, আমিই এককড়িবাবুর কান ভারী করে দিয়ে ওর চাকুরিটা খেয়েছি। হ্যাঁ, এরকম কিছু ভাবাও অস্বাভাবিক নয়। আপনাদের দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে আপনার কথায় এ সত্যই বেরিয়ে এসেছে, ঐ ভদ্রলোকটির বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারেই নেই। আর অন্যের হাতে তামাক খাওয়া ও'র সবচেয়ে বড় দোষ, তাই ত?

হ্যাঁ, একেবারে hundred percent ঠিক। এই ত, আপনি কত সহজে ব্যাপারটা ধরে ফেললেন! জলধি হেসে ভাবে গদগদ হয়ে বললে, আপনার মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোককে ব্যাপারটা বুঝতে যেখানে এক মিনিটও লাগল না সেখানে মণির জন্য পুরো একটা ঘণ্টা ব্যয় করতে হ'ল।

রমেন বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায় হেসে বললে, ঠিকই বলেছেন জলধিবাবু, শুধুমাত্র বুঝাবার লোকের বিচক্ষণতা থাকলেই হ'ল না, যাকে বুঝাবেন ওরও ত বুঝার ক্ষমতা থাকা দরকার।

জলধি হেসে বললে, ঠিকই ত।

নইলে পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রম বলেই গণ্য হয় জলধিবাবু।

ঠিক কথা। একেবারে hundred percent ঠিক।

জলধিবাবু, দয়া করে বসুন। আপনি অতিথি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি—দয়া করে বসুন। মণির জন্য আপনার অমূল্য সময়ের এতটা সময় ব্যয় করলেন। আমি না হয় আর পাঁচটা মিনিটই নিলুম। বসুন, মনে হয় কয়েকটা কথা খোলাখুলি আলোচনা হয়ে যাওয়া ভাল।

জলধি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গিয়ে বসতে বসতে বললে, না, মানে বেলা বেড়ে যাচ্ছে কিনা, তাই—আমি আবার রৌদ্রে চলাফেরা করতে পারিনে, খুবই কষ্ট হয়।

রমেন বিদ্রূপের স্বরে বলল, মণির জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন করতে গিয়ে ত সূর্যদেবকে মাথার ওপরে তুলেই দিয়েছেন। এবার থেকে কিন্তু তার পশ্চিম দিকে হেলার পালা জলধিবাবু। আর একটু বসলে সূর্যের তেজ কমবে বৈ বাড়বে না।

জলধি তামাকের নিকোটিনে তামাটে হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বের করে অপ্রতিভ ভাবে একটুখানি হেসেই আবার গাম্ভীর্য ধারণ করল।

রমেন বললে, জলধিবাবু, যে-কথা বলার জন্য আপনাকে নতুন করে কষ্ট দেয়া। বলছি শুনুন—যার চাকরি যাওয়ার জন্য আপনি কুম্ভের কান্না জুড়ে দিয়েছেন—

জলধি সচকিত হয়ে রমেনের দিকে তাকিয়ে বললে, তার মানে?

মানে মণির চাকরি যাওয়ায় আপনি খুবই ভেঙে পড়েছেন কিনা। তাই বলছি, এর আসল পরিচয় কিছু জানেন কি?

কেন? না জানার কি আছে? মণি এক ভদ্রসন্তান। শিক্ষায়-দীক্ষায় আচার-

আচরণে শিষ্টাচার ও কর্মকুশলতায় সব দিক থেকে আদরনীয়া। এর বেশী আর কি জানার থাকতে পারে রমেনবাবু ?

রমেন গম্ভীর স্বরে কথাটা ছুঁড়ে দিল. আমি বলব, মণির আসল পরিচয় আপনি বা আপনার এককড়িবাবু কেউই কিছু জানেন না।

হেঁয়ালি রেখে কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন রমেনবাবু। আপনিই বা এর সম্বন্ধে আর বেশী কি জানেন ?

আমি যা জানি বললে আপনি এর পিছনে ঘুরঘুর করা ত দূরের কথা আর এক মুহূর্তও এখানে কিন্তু বসবেন না জলধিবাবু।

জলধি সচকিত হ'ল। একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

রমেন বলে চলল, মণি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'এ-মেয়ে ত মেয়ে নয় দানবী নিশ্চয়।'

জলধি যেন আচমকা একটা হোঁচট খেল। কোনরকমে টাল সামলে নিয়ে বললে, দানবী ! কী সব যা-তা বলছেন মশাই !

এখন আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে বটে। কিন্তু এর কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত শুনলে আপনার এ আকস্মিক বিস্ময়টুকু কেটে যাবে। তবে সংক্ষেপে বলছি, শুনুন—না, আগে আপনাকে দুটো কথা বলে নেয়া দরকার। জলধিবাবু, আমরা জানি, দেবতাদের প্রসন্ন করার দুটো বিশেষ ধারা প্রচলিত আছে। তাদের একটা স্তব, আর দ্বিতীয়টা মন্ত্র। এতে দেবতা তুষ্ট হয়ে বর দিতেও পারেন, আবার নাও পারেন। আর মেয়েদের প্রসন্ন করতে হলে চাই উপযুক্ত গুণ, আর দেহসৌষ্ঠব। নইলে কিন্তু পিছন পিছন ছুটোছুটিই সার হয়।

জলধি রমেনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হাতড়ে হাতড়ে ছাতাটা হাতে নিল।

জলধি ওঠার উদ্যোগ করছে দেখে রমেন মুচকি হেসে বললে, বসুন মশাই, বসুন ! এমনও ত মণির গুণকীর্তন শুরুই করলুম না, আর আপনি কিনা ওঠার উদ্যোগ করছেন ! রমেন জলধির দিকে সামান্য ঝুঁকে এবার বললে, সত্যি কথা বলুন ত, কল্যাণ-সমিতির চাকরিটা মণিকে হারাতে হ'ল কেন ?

জলধি আমতা আমতা করে বললে, কেন আবার, এককড়িদা কল্যাণ-সঙ্ঘের সর্বেসর্বা। মণিকে ওঁর পছন্দ নয়, তাই—

এটাই আসল কথা ? আমি কিন্তু অন্য কথা বলব জলধিবাবু, অবশ্য সবই আমার ধারণা, নিজে কানে ত শুনিনি। আপনি মণির চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করে এককড়িবাবুকে তাতিয়েছেন।

জলধি যেন আকাশ থেকে পড়ল, আমি ! আমি এককড়িবাবুকে তাতিয়ে দিয়েছি ! কেন মিছে আমার অপরাধী করে মণির কাছে ছোট করছেন রমেনবাবু। তাছাড়া এককড়িদার ধাত মণিও ত কিছু কিছু জেনেছে। উনি এমন এক ধাতু দিয়ে তৈরী যিনি অন্যের বুদ্ধি নেয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার মূল্যই বেশী দিয়ে থাকেন।

যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা—মানে আমি আর মণি দু'জনে গঙ্গার ধারে রাত্রি কাটিয়েছিলুম বলে মণির চরিত্র নিয়ে আপনার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, ঠিক বলিনি ?

আপনারা যেখানে খুশী রাত্রি কাটান, আমার তাতে মাথা-ব্যথার কি থাকতে পারে।

রমেন বিদ্রূপের স্বরে কথাটা ছুঁড়ে দিল, যার পায়ে নিজের মাথাটা লুটিয়ে দিতে চাইছেন, সে ভালবাসার পাত্রী অন্য এক পুরুষের সঙ্গে গঙ্গার ধারে রাত্রি কাটিয়েছে শুনলে কোন পুরুষ মানুষের মাথা ঠিক থাকে মশাই। আপনার শরীরটাও ত রক্ত-মাংস দিয়েই গড়া আপনাকে আর দোষ দেব কি করে ? যাক, যে-কথা বলতে চাচ্ছি, আমরা কিন্তু প্রেম-বিলাসের তাগিদে গঙ্গার ধারে নৈশ-বিহারে যাই নি জলধিবাবু। প্রেম-রোমান্সের গন্ধও ছিল না সেখানে।

জলধি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে রমেনের দিকে তাকাল।

রমেন বলে চলল, জানি না আপনি ইংরেজ-সরকারের গুপ্তচর কিনা। আপনার ওপর এটুকু বিশ্বাস আমার অবশ্যই আছে বলেই বলতে ভরসা পাচ্ছি, আমরা সেরাত্রির অন্ধকারে ডায়মন্ডহারবারে নদীর ধারে বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছিলুম আমাদের বাঞ্ছিত জাহাজের প্রত্যাশায়। জাহাজ থেকে আর্মস নামবার কথা ছিল।

জলধি চমকে উঠে বললে, কি বললেন মশাই, আর্মস !

রমেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে, মণি ও আমি উভয়েই বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য কিনা ! আসল কথা কি জানেন জলধিবাবু, আসলে আপনাদের কল্যাণ-সংঘের কাজটা মণির কাছে সন্ত্রাসবাদী দলের কাজকর্ম চালানোর পক্ষে একটা অবলম্বন ছিল, এই আর কি, বলতে পারেন, এখানে ওর একটা মাথা গোঁজার জায়গা একান্ত দরকার ছিল—

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জলধি ড্যাবা ড্যাবা চোখে রমেনের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই আড় চোখে মণির দিকে তাকিয়ে বার কয়েক ঢোক গিলল। জিভ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া গলাটাকে একটু ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললে—মণি তোমায় শত কোটি নমস্কার ! যা শোনলাম এতেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা ! এর সঙ্গে এতদিন কাজ করেছি ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ! গুষ্টি সুদ্ধর হাতে হাতকড়া যে পড়েনি পিতৃপুরুষের ভাগ্য ভাল মশায় ! খুব হয়েছে—কথা বলতে বলতে ছাতাটা হাতে নিয়ে জলধি ওঠার চেষ্টা করল।

রমেন তেমনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে এবার বললে, কি ব্যাপার জলধিবাবু, ভয় পেলেন নাকি ? এতেই ঘেমে নেয়ে একসার হয়ে গেছেন যে ! বসুন, সবে ত মুখবন্দনা, আসল প্রসঙ্গ ত শুরুই করিনি এখনও। আসলে আপনাদের কল্যাণ-সংঘ নন্-পলিটি-ক্যাল সংস্থা হওয়ায় ওর আড়ালে মণির গোপনে সন্ত্রাসবাদী দলের কাজকর্ম চালাবার সুযোগ করে নিয়েছিল। আর আপনার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিনা স্বেচ্ছায় ওর সংস্রবেই আসতেই লালায়িত ! আমরা ত মশাই প্রাণের মায়া তুচ্ছ করেই দেশের কাজে

মেতেছি। বলতে পারেন, আমাদের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশ। যে কোন সময় পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিতে পারি, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারি। আর যদি নেহাৎ ক্ষমাঘেন্না করে তবে হয়ত যাবজ্জীবন জেলের ঘানি টানার একটা হিল্লে করে দেবে। অন্ধকারায় বসে ধুঁকেব পিতৃদত্ত জীবনটা কোনরকমে টিকে থাকবে, এই যা।

জলধি চোখ দুটো কপালে তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলে, কী মারাত্মক মেয়ের বাবা! কল্যাণ-সঙ্ঘের নন্-পলিটিক্যাল লেবেলের আড়ালে—

তার কথা শেষ করতে না দিয়েই রমেন বললে, তা নয় ত কি? আপনাদের পঞ্চাশ টাকা বেতনের লোভে সে এখানে, এই আধা শহরে পড়ে আছে ভেবেছেন?

টাকে হাত বুলতে বুলতে জলধি বললে, বিশ্বাস করুন রমেনবাবু, মণিকে নিয়ে এধরণের সমস্যার মুখোমুখি কোনদিন হতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন! আমার মশাই সাদা মনে কাঁদা নেই। মেয়েটার বিদ্যা-বুদ্ধি রয়েছে যথেষ্ট। তার ওপর হাতের লেখাটাও একেবারে ঝকঝকে চকচকে। এককড়িদা আমায় বললে, পঞ্চাশ টাকা বেতনের বিনিময়ে কল্যাণ-সঙ্ঘ একটা অ্যাসেট পেয়েছে। আমিও ওনার কথায় মাতামাতি করতুম। কিন্তু মণির আসল পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। আপনি বলছেন, সে বিপ্লবী, সন্ত্রাসবাদী? কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা! একেবারে ঝাড়ে বংশে নিপাত— কথা বলতে বলতে জলধি ছাতাটা পাশ থেকে টেনে নিয়ে ওঠার উদ্যোগ করল।

রমেন রীতিমত হায় হায় করে উঠল, আরে করছেন কী জলধিবাবু? আপনি দেখছি এতেই হতাশ হয়ে পড়লেন! এখনই ওঠার উদ্যোগ করছেন যে! সবটুকু শুনে যান। নইলে আপনিও মণির সম্বন্ধে পুরোপুরি একটা ধারণা নিয়ে যেতে পারবেন না, আর না শোনাতে পারায় আমাকেও অস্বস্তিতে ভুগতে হবে।

জলধি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললে, আর দরকার নেই মশাই। যেটুকু বললেন, এতেই আমার চিত্ত চমৎকার! আসলে জেল খাটার ভয়েই আমরা, মানে আমি, এককড়িদা প্রভৃতিরা পলিটিক্সে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের সাইনবোর্ডের আড়ালে গা-ঢাকা দিলুম। আপনিই বলুন ত মশাই, দেশোদ্ধারের নেশা যাদের রক্ত-মাংস-মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে ওরা কি শুধুমাত্র পেটের চিন্তায় মজে গিয়ে জীবনটাকে সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, নাকি কখনও উচিত?

রমেন মুচকি হেসে বললে—সে-ত অবশ্যই।

আসলে সোসাল সার্ভিসের পোকাটা এককড়িদার মাথায় আমিই প্রথমে ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম।

তাই নাকি? মুচকি হেসে রমেন বললে।

তবে আর বলছি কি মশাই। এককড়িদাকে হঠাৎ বন্দেমাতরমের রোমাঞ্চকর ধ্বনি ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। ব্যস, দু'মাস জেল। নাকে-মুখে ঢুকল পাঁক।

রমেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

জলধি এবার বললে, আরে বুঝলেন না মশাই! জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গাঁটের

পয়সা খরচ করে যেসব জেলবন্দী বিপ্লবীদের সংসার চালিয়েছিলেন শেষে একদিন ওরাই চোর বলে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে, তখন তাঁর আর সইল না পলিটিক্সের ক্ষুরে নমস্কার দিয়ে বইপত্তর নিয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নিলে। কিন্তু যার চোখে দেশোদ্ধারের মৌতাত বইয়ের কালো অক্ষরগুলোতে মন ভরবে কেন? তখন যা হোক কিছু করার জন্য আমারও মন খুব চঞ্চল। আমি যে এক গোয়ালেরই গরু। সদ্য পলিটিক্সে ইস্তফা দিয়ে বেকার হয়ে পড়েছি। একদিন এককড়িদাকে বললুম, দাদা, রাজনীতির পাকচক্করে আর মাথা গলাচ্ছি না।

এককড়িদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাই বলে জলধি জীবনটাকে ত এ ভাবে নিতান্তই ব্যর্থ করে দেয়াও ত চলে না, দেশের কোন কাজেই কি লাগবে না? এ-দুর্গতি যে সহ্য করা যায় না ভাই।

আমি বললুম, এককড়িদা, অবশ্য যদি অভয় দেন একটা ফন্দি দিতে পারি। রাজনীতির কচকচানি ছেড়ে চলুন সোস্যাল সার্ভিসে ঝুলে পড়ি।

আমার কথা শুনে এককড়িদা ঠোঁট থেকে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে আচমকা সোজা হয়ে বসলেন। ওর চোখে-মুখে অত্যুগ্র আগ্রহটুকু লক্ষ্য করে আমি সোৎসাহে বলতে লাগলুম, হ্যাঁ এককড়িদা, আমাদের পক্ষে সোস্যাল সার্ভিসের পথটা বেছে নেয়াই সব চেয়ে নিরাপদ। ফাঁসির ভাবনা থাকবে না, জেল খাটার ভীতি মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেবে না, কারো বিষনজরেও পড়তে হবে না।

বিদ্যা, জ্ঞান অর্জন, চারিত্রিক শুদ্ধতা ও সঞ্চয় প্রভৃতি থেকে দেশের মানুষকে দূরে ঠেলে রাখার জন্য দু'চোখে কৌশলের ঠুলি পড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আমার কথায় এককড়িদার মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, জলধি, তুমিই আমার সত্যিকারের হিতাকাঙ্খী। তুমিই আমায় বাঁচার আনন্দের সন্ধান দিয়েছ। আমি রাজী জলধি, তোমার পরামর্শ নিতে আমি রাজী।

সত্যি এককড়িদা, আমাদের মত রাজনীতির পোকা যাদের মাথায় ঢুকেছে, একমাত্র সংসারের আবর্তকেই যারা পরম কাম্য ব'লে জ্ঞান করে তৃপ্ত থাকতে পারে না, সমাজ-সেবামূলক কাজই ওদের বাঁচার আনন্দের একমাত্র দিশারী।

হ্যাঁ জলধি, আমার পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করতে তোমার সক্রিয় সহযোগিতা আমার পক্ষে যে একান্তই অপরিহার্য ভাই।

'আমার অবস্থা—"রাই আমিও তা-ই চাই।' তবু মনের ভাব গোপন রেখে বললুম, এককড়িদা, চাইলে আপনার পাশে পাশে থেকে ছোট-ভাইয়ের মত হুকুম তামিল করতে পারি।

এককড়িদা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি হবে আমার কাজের অন্যতম সহায়ক, হবে নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার সেক্রেটারি। ব্যস, সেই থেকে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল, গড়ে উঠল স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘ।' দেশের কাজ করতে এসে যে শেষ পর্যন্ত

হাতকড়া পরার উপক্রম হবে, কে সেদিন জানত মশাই। তারপর এক সময় কল্যাণ-সঙ্ঘের কাজে যোগ দিল মণি। তার পেটে পেটে যে এমন সর্বনেশে বুদ্ধি, ঘুণাক্ষরেও কি আমরা টের পেয়েছিলুম!

রমেন ম্লান হেসে বললে, তবেই ভেবে দেখুন, খাল কেটে কী কুমীর এনেছিলেন আপনারা!

জলধি ছাতাটা হাতে নিয়ে গাত্রোত্থান করতে করতে বললে, আমার পিতৃ পুরুষের ভাগ্য ভাল, আপনার দেখা পেয়েছি। নইলে মণির গুণের কথা যে, জানতেই পারতুম না। আমার সাধ মিটে গেছে মশাই মণি জাহান্নামে যাক, আমি ফিরেও তাকাব না। রমেন বাবু, যদি অনুমতি করেন, এখন আসি।

আপনার অমূল্য সময়ের কিছুটা ছিনিয়ে নিলুম বলে আশা করি ক্ষমা করে দেবেন।

বললুমই ত পরমেশ্বরের অশেষ করুণা তাই আপনার দেখা পেয়ে গেছি। ক্ষমা করে দেব কি মশাই,—আমি আসছি, নমস্কার।

জলধি চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, মণি কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতিই হবে না। এটুকু অন্ততঃ জানবে তোমার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। আর নয়, আমি আসি।

কথা বলতে বলতে জলধি চৌকাঠ ডিঙিয়ে রোয়াকে পা দিল।

মণি এতক্ষণ জানালার ধারে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। খোলা-জানালা দিয়ে নীল আকাশের গায়ে টুকরো টুকরো মেঘের অলস আনাগোনা দেখছিল। জলধি বিদায় নিতেই সে পিছন ফিরে গালটিপে হেসে বললে, দিলে ত ভদ্রলোককে ভিমড়ি খাইয়ে।

রমেন মুচকি হেসে বললে, কেন মিথ্যে বলেছি? যা ঘটনা তার একচুলও বাড়িয়ে বলিনি মশাই। তাছাড়া লোকটা কেমন তোমার পিছনে জোঁকের মত লেগেছিল, আশা করি আমার চেয়ে তুমি ভালই জান।

এটা অবশ্য মিথ্যে বল নি।

আমি যা করলুম তাতে আর কিছু না হোক তুমি স্বস্তি পাবে মণি।

ভাবছি—.

ভাবছ? কি ভাবছ মণি? এতে আবার তুমি মুষড়ে পোড়ো না যেন মণি।

তুমি সেভাবে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করে শুনালে তাতে নতুনতর বিপদ এসে পথ আগলে না দাঁড়ায়।

রমেন ভ্রূকুঁচকে বললে—কি রকম?

ভদ্রলোক যদি পুলিসের লোক হোন? গুপ্তচর টর হন, তবে?

ধ্যুৎ! তুমিও পাগল হয়েছে মণি! থানার দরজা পর্যন্ত যাওয়ার মত বুকের পাটা ওর থাকলে ত। তারপরও কথা আছে।

যেমন?

তোমার প্রতি ওর দুর্বলতাই ওকে ওকাজ থেকে নিরস্ত করবে, জেনে রেখো।

মণি সরবে হেসে উঠল।

স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের অফিস। প্রতিষ্ঠানের সদস্য বিশ্বম্ভর পুরোনো কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করছে। ওর চোখে পুরু কাঁচের চাঁদির চশমা। বৃদ্ধ না হলেও পৌঢ় বলা চলে। তার বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

জলধি বারান্দা থেকে হাঁক পাড়তে-পাড়তে ঘরের দিকে আসতে লাগল, এককড়িদা! এককড়িদা! দরজার কাছে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে এককড়ি ঘরে অনুপস্থিত। বিশ্বম্ভরকে কাজে ব্যস্ত দেখে ও বললে, বিশ্বম্ভর বাবু, আপনি অসময়ে – এককড়িদা কোথায়?

বিশ্বম্ভর কাগজে মুখ রেখেই জলধির প্রশ্নের জবাব দিলে, উনি একটু বেরিয়েছেন, এক্ষণি ফিরবেন, বলে গেছেন।

জলধি অপ্রতিভ হয়ে বললে, ও তাই বুঝি?

কিন্তু ব্যাপার কি জলধিবাবু? অমন চেঁচাতে চেঁচাতে হন্তদন্ত হয়ে কোত্থেকে এলেন? কাগজ থেকে মুখ তুলে বিশ্বম্ভর কথাটা বললে। আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে ঘরে আগুণ লেগেছে! কি ব্যাপার বলুন মশাই? পাগলা কুকুরে তাড়া করেছে নাকি?

জলধি বেশ রাগত স্বরেই কথাটা ছুঁড়ে দিলে. কী সাঙ্ঘাতিক মেয়েরে বাবা! মেয়ে না ত যেন কালবৈশাখী! কেন? কার কথা বলছেন জলধিবাবু? বিশ্বম্ভর হেসে বললে। কার আবার, আপনাদের, বিশেষ করে এককড়িদার চোখের মণি ওই মণির কথা বলছি।

কি বললেন জলধিবাবু, আমাদের মণি?

অবশ্যই। এককড়িদা ছুঁড়িটার মধ্যে কি দেখেছেন, জানিনে মশাই। আমি ও ত বলি. মণির পুরুষালি চেহারাটার মধ্যে, এককড়িদা এমন কি রূপের জৌলুষ দেখেছেন, তিনিই জানেন মশাই।

বিশ্বম্ভর পুরু কাঁচের চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, একটা কথা বলছি জলধিবাবু. রাগ করবেন না ত?

এতে ইতস্ততের আছে কি বলবেন, বলেই ফেলুন না বিশ্বম্ভর পূর্ব ভঙ্গিমায় তাকিয়েই কথাটা ছুঁড়ে দিল, শুধুই কি এককড়িবাবু? কেন আপনিও ত কিছু কম যান না মশাই। আমরা ত আর চোখে ঠুলি পরে থাকি না যে, কিছুই দেখি না, কিছুই বুঝি না। জলধি থতমত খেয়ে বললে, তার মানে? তার মানে? একথা বলার অর্থ?

বিশ্বম্ভর হাত দিয়ে চশমাটা যথাস্থানে বসাবার চেষ্টা করে বললে, অর্থটা খুবই কঠিন নাকি জলধিবাবু যে, অমন ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে তাকিয়ে রইলেন যে বড়?

এককড়িদা কল্যাণ-সঙ্ঘের স্বত্বাধিকারী আর আপনি সেক্রেটারী. ছুঁড়িটার একটু কৃপাদৃষ্টির প্রত্যাশায় ত সর্বদা ওর পিছন পিছন দুজনই ঘুরঘুর করে বেড়ান। ভেবেছেন, আমরা চোখের মাথা খেয়ে বসেছি, না?

জলধি অপ্রতিভ হয়ে বললে, আমি? আমি ঘুরঘুর করতুম? বাজে কথা, তাহা মিথ্যে কথা। অমন কত মণি আমার মন গলাতে চেষ্টা করেছে, কাছেও ঘেঁষতে পারে নি বিশ্বম্বর বাবু, জেনে রাখবেন।

তা অবশ্য হলেও হতে পারে জলধি বাবু। কিন্তু কাজ করতে করতে অমন লোভাতুর দৃষ্টিতে আপনাকে ওর দিকে কতদিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি, তার হিসেব লিখে রাখলে একটা খাতা শেষ হয়ে যেত মশাই! তখন আপনার জিভ দিয়ে জল গড়াত কিনা বুঝতে পারতুম না বটে। তবে দৃষ্টিতে লালসা মাখানো থাকত পুরো দস্তুর। আর এককড়িদার কথা শুনবেন? পাকা বেলের দিকে যেমন কাকগুলো দূরে থেকে লালসা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর অবস্থাও হ'ত একই রকম! অতএব আপনারা কেউই ধোয়া তুলসিপাতা নন মশাই।

এমন সময় বারান্দায় এককড়ির চটির শব্দ পেয়ে উভয়েই রসনা সংযত করে গাম্ভীর্য ধারণ করল। বিশ্বম্বর আবার নীরবে পুরণো কাগজপত্র ঘাটাঘাটি শুরু করে দিল।

এককড়ি চটিতে খটখট আওয়াজ তুলে চৌকাঠের কাছে হাজির হ'ল।

জলধি টেবিল থেকে একটা পুরনো প্রবাসী পত্রিকা তুলে চোখের সামনে ধরল। এমন একটা ভাব করলে যেন বইয়ের পাতায় পুরোপুরি আত্মমগ্ন! অন্য কোন দিকে ওর সামান্যতম খেয়ালই নেই।

এককড়ি চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়েই ম্লান হেসে বললে, জলধি কখন এলো!

জলধি চোখের সামনে থেকে পত্রিকাটা সরিয়ে বললে—এই ত কয়েক মিনিট আগে। বিশ্বম্বরবাবুর কাছে শোনলুম, আপনি বেরিয়েছেন, কিছু ক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। তাই ভাবলুম, দেখা করেই যাই।

তা বেশ। কিন্তু জলধি, অসময়ে তোমার আগমন হ'ল যে?

জরুরী প্রয়োজন না থাকলে অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার এতটুকু উৎসাহও আমার নেই এককড়িদা।

এমন কি জরুরী ব্যাপার বলত ভায়া?

আপনার মণির কথা বলতে এসেছিলুম এককড়িদা।

আমার মণি? তা বেশ, মণি না হয় আমারই হ'ল মেনে নিলুম। কিন্তু কি ব্যাপার? কি করেছে মণি?

কি করেছে? বরং বলুন, কি করে নি! আপনার মত একজন বাঘা রাজনৈতিক নেতাকে মণির মত একটা পুঁচকে মেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘোল খাইয়ে ছাড়লে!

কি রকম? কি হয়েছে, খোলসা করে বলত ভায়া!

মণির আসল পরিচয় কিছু জানেন এককড়িদা!

এককড়ি মুচকি হেসে বললে, আসল পরিচয়? মণির আসল পরিচয়? এ আবার কি রকম কথা! আসল পরিচয় আবার কি?

হাঁ, মণির আসল পরিচয় কিছু জানা আছে এককড়িদা?

এককড়ি মুখে হাল্কা হাসির রেখাটুকু অক্ষুন্ন রেখেই বললে,—মণির আবার আসল পরিচয় বলে কি থাকতে পারে জানি নে বাপু! ও আমাদের স্বদেশ কল্যান-সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল। শিক্ষা দীক্ষা রুচি চারিত্রিক গুণ আর ওর কর্মনিষ্ঠা অতুলনীয়, অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ছাড়া মণির মধ্যে আর কোন্ বিশেষ গুণের পরিচয় তুমি কি পেয়েছ, জানি নে বাপু!

সেই জন্যই ত বলছি এককড়ি দা। আপনি সত্যই মণির ব্যাপারে যে তিমিরে, ছিলেন, আজও সেখানেই রয়ে গেছেন।

চাকর এসে এককড়িকে তামাক সেবনের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে দিয়ে গেল। গুড়গুড়ির নলটা ঠোঁটের কাছে তুলতে গিয়েও নামিয়ে নিয়ে এল। কপালের চামড়ায় বিরক্তির ছাপ এঁকে বললে, জলধি, তুমি ত ভালই জান, আমি ধানাই প্যানাই পছন্দ করিনে। আর তুমি কিনা সেই থেকে অর্ধেক কথা পেটে পেটে রেখে দিচ্ছ। তোমার যদি সত্যই কিছু বলার থাকে খোলসা করে বল। নইলে আমায় একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জলধি হাত কচলে নিবেদন করলে, এককড়িদা আমি এইমাত্র মণির সাঁকরেদ সেই রমেনের সঙ্গে কথা বলে এলুম।

জলধি, এতদিন তোমার সঙ্গে কাটালুম আর এটুকু বুঝি নে! তুমি এখনও আগের মতই মণির পিছনে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জলধি, মণির মুড়ো ঝাঁটা তোমার কপালে নাচছে!

আপনি কি ভাবছেন, আমি নষ্টামি করতে ভর দুপুর বেলা মণির কাছে ছুটে গিয়েছি নাকি।

না, তুমি একেবারে সতীলক্ষ্মী এককড়ি। যাকে বলে ধোয়া তুলসি পাতা! তোমায় আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

এককড়িদা, বার বার কথার মোড় ঘুরিয়ে আপনি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। আমায় আসল কথাটাই ত বলতে দিচ্ছেন না।

মুচকি হেসে এককড়ি বললে, ঠিক আছে, বল শুনি, তোমার আসল কথাটা কি?

মণি ত ভেঁজা বেড়ালের মত এতদিন আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আসলে মেয়েটা একেবারে পুরণোপাপী। আর ওর সাঁকরেদ ঐ রমেন ছোড়াটা—

ওর কথা শেষ করতে না দিয়েই এককড়ি বলে উঠল, জলধি, রমেনের কথা এখন থাক। আগে মণির ব্যাপারে তোমার কি অভিযোগ আছে, বল। নইলে এক সঙ্গে দুইদিক সামলাতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

জলধি অপ্রতিভ হয়ে বললে, ঠিক আছে, তাই বলছি। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে এবার বললে, কিন্তু এককড়িদা, আমার যা কিছু বক্তব্য সবই যে ওদের দু'জনকে জড়িয়েই।

গড়গড়ির নলটাকে মুখ থেকে নামিয়ে এনে এককড়ি বললে, ঠিক আছে, . । বল শুনি।

জলধি একটু নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করলে, হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম, মণি ও রমেন উভয়েই ধুরন্ধর, যাকে বলে একেবারে শেয়ালের মত ধূর্ত।

এককড়ি বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললে, সে কী হে জলধি! যে-মণির প্রশংসায় তুমি এতদিন পঞ্চমুখ ছিলে আজ তুমিই আবার ওকে ধূর্ত ধুরন্ধর বলছ! তোমার মোহ ভঙ্গ যে করতে পারল, সে-কৃতী ব্যক্তিটি কে, জানতে পারি কি?

জলধি এ-বক্রোক্তি যে ধরতে পারে নি তা নয়। কিন্তু এ-ও জানে এ-মুহূর্তে এককড়িকে চটিয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে ওর কথার মারপ্যাচ না বুঝার ভান করে বললে, এককড়িদা, একটু আগে ত বললুমই, আমি রমেন ছোড়াটার সঙ্গে কথা বলে এসেছি।

এককড়ি গড়গড়ির নলটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বললে, ঠিক আছে, কি বলতে চাইছিলে বল।

শুনুন দাদা, ছোড়াটা আমায় পরিষ্কার বললে, সেদিন বজবজে গঙ্গার ধারে ওরা দুটিতে কেন গিয়েছিল, কেনই বা সারাটা রাত্রি ওরা গঙ্গার ধারে কাটিয়েছিল। শুনলে আপনার রক্ত হিম হয়ে—

তার মুখের কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই এককড়ি বলে উঠলে, কেন আবার জ্যোৎস্নামাখা রাত, গঙ্গা উত্থিত ফুরফুরে হাওয়ার খাদকতায় নৈশ-বিহার—

ধুৎ, বাজে কথা। সব বাজে কথা এককড়িদা। আপনাকে, আমাকে উভয়কেই বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

এককড়ি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললে, এ কী বলছ জলধি! তবে কি নৈশ-বিহার প্রেমটেম সব বাজে কথা!

হ্যাঁ দাদা, বাজে কথা। আমাদের কাছে মিথ্যে গল্প ফেঁদেছিল।

এককড়ি সোজা হয়ে বসে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, বলছ কী জলধি! ওদের প্রেম বালবাসা তবে সবই ভূঁয়ো, বাজে কথা! তবে কি তুমি একটা উড়ো খবর নিয়ে এসে মণির চাকরিটা খেলে! আবার এখন এসে মরাকান্না জুড়ে দিয়েছ!

চাকরি ওর এমনিতেই যেত এককড়িদা।

এককড়ি নীরব চাহনি মেলে জলধির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে গড়গড়ি টানতে লাগল। শেষে বললে, তার মানে?

জলধি বলল, আমি ঠিকই বলছি এককড়িদা। ওদিন গঙ্গার ধারে রাত্রি কাটানোর মধ্যে প্রেম-বালবাসা কতটুকু ছিল বলতে পারব না। কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্যের কথা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে, হলফ করে বলতে পারি।

এককড়ি ঠোঁট থেকে গড়গড়ির নলটা নামিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে জলধির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জলধি ব'লে চলল, বিশ্বাস করুন একক্কড়িদা, মেয়েটা একটা জাত সাপ! রমেন ছোড়াটা একটা প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী। আমাদের কল্যাণ-সংঘের ব্যাপার স্যাপার নন্-পলিটিক্যাল লেবেল আঁটা, তাই মণি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল।

এককড়ি সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, এ তুমি কি সব বাজে কথা জুড়ে দিলে। ধাপ্পা মারার আর জায়গা পাওনি, না।

জলধি অনুরোধের স্বরে বললে—এককড়িদা, আমি আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন করছি, ধৈর্য ধরে আমার সব কথা শুনুন। তারপর আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন।

এককড়ি মুচকি হেসে বললে, ঠিক আছে, তাই বল।

সেদিন রাত্রে বিদেশ থেকে এক-জাহাজ গোলা-বারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র আসার কথা ছিল।

এককড়ি চমকে উঠে বললে, বল কি হে জলধি! এযে শুনেই আমার গায়ে রীতিমত কাঁটা দিয়ে উঠছে। একবার জেল খেটেই আমার চূড়ান্ত আক্কেল হয়ে গেছে! আর নয়। সেদিনই নাক-কান মলেছি। আর থানা-পুলিসের ঝামেলা এড়াবার জন্যই নন্-পলিটিক্যাল সংস্থা স্বদেশ কল্যাণ-সংঘ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ সেবায় মন-প্রাণ সঁপেছি। মণি আবার আমায় সে-চক্করে ফেলার যোগার করেছিল! এযে স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না জলধি! কী জাঁহাবাজ মেয়ে'রে বাবা!

তারপর কি হ'ল, বলছি শুনুন এককড়িদা, মণি প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। ও একজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী! সন্ত্রাসবাদী।

কি বললে, মণি প্রত্যক্ষভাবে' সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত?

আর ওই যে রমেন নামে ছোড়াটা ক'দিন মণির কাছে কাটাচ্ছে, ওটা ত পুলিসের নজর এড়াবার জন্যই এ-গ্রামে এসে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। জেল-খাটা ত ওর কাছে জল-ভাত। ইউরোপে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে। মস্তবড় সশস্ত্র বিপ্লবী। সেখানে নাকি প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে বিপ্লবী দল গঠন করে গোপনে ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আর জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্রশস্ত্র চালান দিয়ে বিপ্লবের কাজকে ত্বরান্বিত করছে।

এককড়ি চমকে উঠে বললে, কী মারাত্মক চক্করেই না পড়েছিলুম রে বাবা।

জলধি চেয়ারটাকে এককড়ির দিকে সামান্য টেনে নিয়ে গেল। এবার অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বললে, ইউরোপ থেকে গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ রওনা করিয়ে দিয়ে হতচ্ছাড়া রমেনটা অন্য একটা জাহাজে চেপে সোজা এখানে পাড়ি দিয়েছে।

কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডকারখানা রে বাবা!

মণি সব জানত। ওর সঙ্গে রমেন নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। নিয়মিত চিঠিপত্র লেনদেন হয়। আর আমরা কিনা কল্যাণ সংঘে—

কী জাঁহাবাজ মেয়ে রে বাবা! শুনেই যে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসছে জলধি।

জলধি বললে, আমরা ত কতবারই বলাবলি করেছি এককড়িদা, মণির মত এতসব গুণের সমাবেশ অন্যকোন মেয়ের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, তাই না?

হ্যাঁ, আমরা ত তাই জানতাম জলধি।

আমরা পঞ্চমুখে ওর প্রশংসা করতে গিয়ে বার বার বলেছি, বিদ্যাবুদ্ধি, চরিত্রের নির্মলতা, আর সাহসিকতার দিক দিয়ে মণি সত্যি অনন্যা, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ জলধি, তা-ত বলেছিই আজ আবার নতুন করে বলতে হয় মণি সাহসিকতার দিক দিয়ে বাস্তবিকই অনন্যা। এমন হাসিখুশী প্রাণোচ্ছল মেয়ে যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে আমরা কেউ কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলুম জলধি!

তবেই ভেবে দেখুন এককড়িদা। আর শুধু কি তা-ই? আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত থেকেও নিয়মিত চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

ওর কল্যাণে আমাদের হাতে যে হাতকড়া পড়ে নি, বলতে হয় ঈশ্বরের পরম করুণা!

এককড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, মানে মানে সে আপদ বিদেয় হয়েছে, পিতৃপুরুষের ভাগ্য ভাল।

আপনি ত আপদ বিদেয় করে ডাঙ্গায় উঠলেন এককড়িদা। কিন্তু আমায় যে এদিকে পিস্তলের মুখে ঠেলে দিলেন!

এককড়ি চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, আমি? তোমায় আমি পিস্তলের মুখে ঠেলে দিয়েছি, কি সব যা তা বলছ!

যা-তা বললুম?

তা নয় ত কি? আমার মাথায় তক্ষক আশ্রয় নিয়েছে। আর তা আপনার কল্যাণেই।

মণি'কে কল্যাণ-সঙ্ঘ থেকে বিদেয় করে তোমার আমার উভয়ের পক্ষেই ত মঙ্গলজনক কাজ করেছি।

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এককড়িদা। আপনি রীতিমত একটি পাঁকাল মাছ। পাঁক ঘাটাঘাটি করবেন কিন্তু গায়ে পাঁক মাখতে রাজি নন।

তুমি আবার বাঁকাচোরা কথা বলছ জলধি! যা বলতে চাচ্ছ, খোলসা করে বল। তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তুমি আমায় পাঁকাল মাছটাছ কী সব বাজে কথা বলছ!

এককড়ি ক্রুদ্ধ হয়েছে দেখে জলধি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এবার বেশ একটু নরম স্বরেই বললে, মণিকে আপনি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন নি, সত্যি করে বলুন ত এককড়িদা?

এককড়ি আঙুল দিয়ে কল্কের আগুন উস্কে দিতে দিতে বললে, হ্যাঁ, তা-ত করেছিই। তাতে আমি পাঁকাল মাছ হলুম কি করে বলতে পার?

আপনি তবে স্বীকার করছেন মণি'র চাকরিটা আপনিই খেয়েছেন।

এ-কথা আমি এক শ'বার স্বীকার করব। কল্যাণ-সঙ্ঘের স্বার্থে আমায় এ-কাজ করতেই হয়েছে। তা ছাড়া একটু আগে তোমার মুখে মণি'র যেসব গুণের কথা শুনেছি, জানা থাকলে ওকে কিছুতেই চাকরি দিতুম না তুমিও হয়ত ভালই জান।

দেখুন এককড়িদা, বাইরে থেকে কল্যাণ-সঙ্ঘ আমাদের দশজনের সংস্থা বলে লোকে জানলেও আসলে—

কথাটা ওকে শেষ করতে না দিয়েই এককড়ি ব'লে উঠল, আসলে কল্যাণ-সঙ্ঘের স্বত্বাধিকারী আমি নিজে, এই ত বলতে চাইছ ?

আমায় যদি জিজ্ঞেস করেন তবে আমি এর সঙ্গে আর একটু বাড়িয়ে বলব।

যেমন ?

যেমন আপনি কল্যাণ-সঙ্ঘের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। আমি, মণি সবাই বেতনভুক্ত কর্মী।

ম্লান হেসে এককড়ি বললে, হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই বটে।

অনেকটা বলে আসল প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করবেন না এককড়িদা।

জলধি, আমি সেই থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি বেশ কড়া কথা আমায় শোনাতে চাচ্ছ। বলবে বলবে করেও বলে উঠতে পারছ না। তুমি বলছ, আমি নাকি আসল প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করছি ! কিন্তু তোমার আসল প্রসঙ্গটা কি তাই ত আমার এখনও মাথায় ঢুকছে না।

যে বুঝেও না বুঝার ভান করে ওকে বুঝাতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে কেউ ই নেই। ঠিক আছে, তবে বলেই ফেলি, আপনি কল্যাণ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক—এককথায় সর্বেসর্বা। কাউকে চাকরি দেয়ার মালিক যেমন আপনি, আবার তেমনি চাকরি খেতে গেলে আপনার মতামতই প্রাধান্য পাবে, মিথ্যে বলেছি ?

ভাল কথা। তারপর ?

কিন্তু মণি'র চাকরি খাওয়ার ব্যাপারে কার্যত কি করলেন আপনি ?

কেন ? মণি আমাদের সংস্থার সুনামের প্রতিবন্ধক হতে পারে মনে করে ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি। এ-ব্যাপারে তুমিও ত আপত্তি করনি জলধি।

না, আমি আপনার মতামতের বিরুদ্ধাচারণ করি নি।

তবে এখন আপত্তিটা কোথায় ?

আপত্তি এক জায়গাতেই। আপনি বাড়ি-বয়ে মণি'কে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা জানিয়ে এলেন। কিন্তু ওর চাকরি যাওয়ার জন্য আমায় পুরোপুরি দায়ী করলেন।

এককড়ি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলে উঠল, তার মানে ?

মানেটা বুঝতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে বুঝি। মণিকে কি বলে এসেছেন এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?

এছাড়া আর কি বলেছি, বুঝতে পারছিনে ত যার জন্য তুমি রাগে এমন গজগজ

করছ !

কেন ? আপনি বলে আসেন নি আমার ঘোর আপত্তির জন্যই ওকে আর কল্যাণ-সংঘে কাজ করতে দেয়া যাচ্ছে না, বলেন নি ?

কথাটা কানে যেতেই এককড়ি কেমন যেন আচমকা একটা হোঁচট খেল। আমতা আমতা করে বললে, কথাটা ঠিক এমন স্পষ্ট করে বলি নি জলধি। বিশ্বাস কর, আমি শুধু বলেছি, জলধরেরও একই মত, তোমায় চাকরিতে বহাল রেখে প্রতিষ্ঠানের সুনামটুকু নষ্ট হোক আমি বা জলধি কেউ-ই চাইনা। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়। আরে বাবা, তুমি ত কল্যাণ-সংঘের সেক্রেটারি, ঠিক কিনা ?

হ্যাঁ, খাতায়-কলমে। কিন্তু—

কিন্তু টিন্তুর কথা ছেড়ে দাও জলধি। মণি সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি এতেই আমাদের পিলে চমকে যাচ্ছে ! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হাতকড়া পড়ে জেলের ঘানি টানতে যাব নাকি আমরা !

সে আপনি যা ভাল মনে করেছেন তা-ই করেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আমে-দুধে মিশে যাবে, আর আঁটি গড়াগড়ি খাবে।

জলধি, ব্যাপারটাকে তুমি যে-দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার কর না কেন, মণি'কে তাড়িয়ে আমাদের সব দিক থেকেই মঙ্গল হয়েছে।

মঙ্গল যেটুকু হওয়ার পুরোটাই আপনার পাল্লা ভারী করবে। আর সবটুকু অমঙ্গল আমার বরাতে জুটবে। মণি আর ওই নচ্ছাড় রমেনটাকে আপনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন, জলধি কল্যাণ-সংঘের সেক্রেটারি। ওর অমতে ত আর তোমায় রাখতে পারি নে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও আমায় এ-পথ বেছে নিতেই হচ্ছে। ব্যস, দিলেন ত আমার সর্বনাশটা করে। মণি আর রমেন-এর চক্ষুশূল হলাম আমি। আপনি পাঁক ঝেড়ে ডাঙায় উঠে গেলেন। এবার আমায় বাঁচাবে কে শুনি ?

এককড়ি নীরবে গুড়গুড়ির নল নিয়ে মেতে রইল।

জলধি ব'লে চলল, এককড়িদা, দেশের কাজই বলুন, আর যা-ই বলুন না কেন, মণি আর রমেন সশস্ত্র বিপ্লবী। একটু ঘুরিয়ে বলতে গেলে ওরা ডাকাতি—গুণ্ডামি কোন কিছুতেই পিছপাও নয়। মানুষ খুন করা ত ওদের কাছে খুবই মামুলি ব্যাপার।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য মিথ্যে নয় জলধি।

তবেই ভেবে দেখুন ত, ব্যাপারটা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াল ? রমেনটা আবার কথার ফাঁকে আমায় পকেটে হাত দিয়ে কি যেন একটা দেখালে। নির্ঘাত পিস্তল। আমায় পরপাড়ে পাঠাতে একটার বেশী দুটো গুলি লাগবে না ! বাপরে বাপ ! কী সাংঘাতিক ছেলে রে বাবা ! চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা করে যখন তাকায়, এমনিতেই প্রানে মরার উপক্রম। দরকার নেই এককড়িদা, দেশের কাজ যথেষ্ট করেছি, আর নয়। এতদিন দেশের সেবা করেছি, একেবারে নিস্বার্থ। গোলামি করিনে বলে

লোক ঠকিয়ে জান আর মানটুকু কোনরকমে বজায় রেখেছি। আপনার দয়া দাক্ষিণ্য বা মুষ্টিভিক্ষে—যা ই বলেন না কেন তা দিয়ে কোনরকমে মেসের খরচ আর এক চিলতে খদ্দর কোনরকমে যোগার হয়। ব্যাস, এটুকুতেই সন্তুষ্ট ছিলুম। আপনার আর চিন্তা কি দাদা। বাপ-ঠাকুরদা পোটলা বেঁধে রেখে গেছেন। পঞ্চাশ-একশ ত আপনার কাছে হাতের ময়লার সামিল। জীবন ভর পায়ের ওপর পা তুলে খেলেও কুবেরের ভাণ্ডার শেষ হবার নয়। শেষ পর্যন্ত প্রাণে মরবে এই রাজভিখারীটা।

এককড়ি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে জলধি তোমার এত ভাবনা কিসের বল দেখি? তোমার ত চাল চুলো কিছুই নেই। যেখানে রাত সেখানেই কাৎ। আমি বিপত্নীক হলেও একটা মেয়ে আছে, একেবারে ঝাড়া হাত-পা নয়।

জলধি অপেক্ষাকৃত নীচু গলায়, প্রায় স্বগতোক্তি করল, আজ না হয় চাল-চুলো নেই, হতে কতক্ষণ। এবার তিনকড়িকে লক্ষ্য করে বললে, দাদা, আপনি ত প্রায়ই বলেন, আপনার মামা নাকি মস্ত লোক, তাঁকে বলে কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড বা ইনসিওর কোম্পানীতে হোক—অর্থাৎ আপনাদের স্বরাজ পাণ্ডারা যেখানে একটু প্রভাব-প্রতিপত্তি করতে পেরেছেন, আমার যা হোক চাকরি একটা করে দিন। বেশী কিছু নয়, যেন দুবেলা দুমুঠো খেতে-পরতে পাই, ব্যস।

এককড়ি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল। কি যেন বলতে চেষ্টা করল। ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জলধি আবার বললে, আপনি ত জানেন, আমি দুর্মুখ হতে পারি, কিন্তু দুর্বৃত্ত মোটেই নই।

তা না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ তোমার অমন চাকরির দরকার হয়ে পড়ল যে!

পারিস্থিতিটা হঠাৎই জটিল হয়ে পড়ল, তাই চাকরির চিন্তাও হঠাৎই করতে হচ্ছে দাদা। মণি ও রমেন উভয়েই জানে মণির চাকুরি যাওয়ার মূলে আমি। মণিকে তাড়িয়ে আমি কল্যাণ-সঙ্ঘে নির্বিবাদে চাকরি করতে পারব, ভরসা যে করিনে। আর কিছু না হোক, রমেন-এর পিস্তলের গুলির ভয়ে হলেও কল্যাণ-সঙ্ঘের চাকরি আমায় ছাড়তেই হবে এককড়িদা।

এককড়ি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ওসব পাগলামি বাদ দাও ত জলধি! মণি'র ধাত আমার জানা আছে। ওর নজর এখন দমনরাজ ইংরেজ সরকারের ওপর। তোমার মত একটা কাপুরুষ ছুঁচোকে মেরে মণি বা রমেন করোরই ইচ্ছে নয় অহেতুক হাতগন্ধ করা।

জলধি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে এককড়ির মুখের দিকে তাকাল।

এককড়ি ব'লে চলল, আমার কথা শোন জলধি, ওসব বাজে চিন্তা মাথা থেকে নামাও। বিকেলে সময়মত অফিসে এসো। মণি'র জায়গায় যে ছেলেটাকে নিয়েছি, আজ বিকেলে আসার কথা। ওকে কাজকর্ম যা কিছু বুঝিয়ে দেবে।

জলধি ছাতাটা হাতে নিয়ে ওঠার উদ্যোগ করল। এককড়ি এবার বললে, আর একটা

কথা, মণিকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আমরা চাইলেও ও আর কোন অবস্থায়ই ফিরবে না।

জলধি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এককড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এককড়ি বললে, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মণি ইতিমধ্যেই নারী-সমিতি'র কাজে যোগ দেবে স্থির করে ফেলেছে। সুকল্যাণী মিটার ওর সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। একটা কথা কি জান জলধি। বিত্তবান পিতাকে সুশ্রী মেয়ের বিয়ের জন্য যেমন ভাবতে হয় না, ঠিক তেমনি যার পেটে বিদ্যা বুদ্ধি-জ্ঞান রয়েছে ওকে কাজের জন্য ভাবতে হয় না। মণি'র গায়ে যতই বিপ্লবের গন্ধ থাক না কেন, ওর গুণাবলী ওকে বাড়ি-বয়ে চাকরি যোগাড় করতে সহায়তা করবে, মনে রেখো। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে পার। বিকেলে সময় মত অফিসে আসা চাই কিন্তু।

জলধি ছাতাটা বোগলে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে মেসের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এককড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জলধি বিষণ্ণ মনে মেসে ফিরে গেল। বৃদ্ধ এককড়ি'র তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। সে বিপত্নীক। একটি মাত্র মেয়ে ত্রি-সংসারে ওর আপনজন বলে টিকে রয়েছে। বাপ-ঠাকুরদা অগাধ ধন-সম্পদ রেখে গেছেন; বসে খেলেও তা সারাজীবনে ফুরোবে না। তার ওপর উপরি আয় তেল-কলের অর্থাগম ত রয়েই গেছে। ওর স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পিছনে দুটো কারণ বিদ্যমান। প্রথমত সাংসারিক কাজকর্মের ঝামেলা না থাকায় হাতে অফুরন্ত সময়। তাই কল্যাণ-সঙ্ঘের কল্যাণে দু'দশজন শিক্ষিত-আধা শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের সমাগম হলে সারাদিনের কিছুটা সময় অন্ততঃ ভালভাবে কেটে যায়। দ্বিতীয়তঃ সমাজ-সেবার মাধ্যমে একটু-আধটু নাম যশের ব্যাপার ত রয়েই গেছে। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থের ছিটেফোঁটা খরচ করে যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ক্ষতি কি? কিন্তু জলধি? ওর ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যৌবন গিয়েছে অনেক আগেই। রাজনীতির চক্করে পড়ে যৌবনের দিনগুলো কেটেছে। বিয়ে থা করে ঘর-সংসার করার ইচ্ছে থাকলেও উদ্যোগ নেবার মত কেউ না থাকায় আজ পর্যন্ত জীবন-সঙ্গিনীরূপে কাউকে পাশে পায় নি। কিন্তু আজও আশাহত হয়ে এপথ থেকে সরে দাঁড়ায় নি।

যৌবন কাটিয়ে জলধি পৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সুপ্রশস্ত টাকের চারধারে কয়েক'টা চুল অবশিষ্ট রয়েছে তাতেও পাক ধরেছে। চোখে উঠেছে চশমা। ঠিক এমনি সময়ে স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের দৌলতে দেখা পেল মণি'র। মণি অবিবাহিতা। কথা বলে জানতে পেরেছে। ওরও আপনজন বলতে কেউ-ই নেই। অসহযোগের প্রবল বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে ওর জীবনের ভাঙা তরীটা এখানে এসে ঠেকেছে। সঙ্গে

বুড়ো বাবা ছিলেন। জরাজীর্ণ হাড়ে জেলের অত্যাচার সইতে পারল না। আরও কিছুদিন জেলের গারদ ধরে ধুঁকতে-ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ বুড়ো মেরে খুনের দায় এড়াবার জন্য শেষ পর্যন্ত ওকে জেলের বাইরে বের করে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে। তারপর মণিমালা বুড়ো বাপকে নিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে করতে করতে আরও কিছুদিন কাটিয়ে দিল। এক সময় মণি'কে এ-স্বার্থপর পৃথিবীতে একা ফেলে রেখে ওর বাবা মরে বাঁচল। মণি'র পিছু টান বলতে আর কিছুই রইল না। অন্য সব বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেও মণি কিন্তু রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে সরে থাকার কথা ভাবতেও পারে নি এক মুহূর্তের জন্যও। পারার ত কথাও নয়। রাজনীতির বীজ যে ওর রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে। পৈত্রিক সূত্রে দোষ বা গুণ যা-ই বলা হোক না কেন, কেবল মাত্র এটুকুই পেয়েছে। এটুকু বয়সের মধ্যে দু'-দু'বার জেলও খেটে নিয়েছে। অতএব সবদিক থেকে ভিত একেবারে পাকা পোক্ত।

মণিমালা'র বাসায় রমেন-এর সঙ্গে জলধি'র বোঝাপড়া হবার পর দু'দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জলধি মনমরা হয়ে দুটো দিন মেসেই কাটিয়ে দিয়েছে। কারো সঙ্গে কোন কথা নেই। কল্যাণ-সঙ্ঘের অফিসে যাওয়া ত দূরের কথা মেসের কারো সঙ্গেও তেমন একটা কথাও বলে নি। আম-কাঠের নড়বড়ে চৌকিটা আশ্রয় করেই কাটিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় দিন বিকেলে খদ্দরের ফতুয়াটা গায়ে চাপিয়ে গুটিগুটি চলল এককড়ি'র সঙ্গে দেখা করতে।

জলধি সদর রাস্তায় উঠে বুড়ো-শিবতলার ধার দিয়ে নেমে যাওয়া সরু রাস্তাটা ধরল। বাঁক ঘুরে কয়েক পা এগোতেই মণি'র সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

মণি সুকল্যাণী মিটারের সঙ্গে পাশের গ্রামে গিয়েছিল। নারী-সমিতির একটা ঘরোয়া বৈঠক সেরে ফিরছে। সুকল্যাণী মিটার দুপুরের পর ওকে বাসা থেকে নিজে গাড়ী নিয়ে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ওর বাসার কাছাকাছি ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতেই ভদ্রমহিলা চেয়েছিলেন। অহেতুক ওকে বাড়তি পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্যই মণি গাড়ী থেকে নেমে যায়। সুকল্যাণী মিটার তবু বলেছিলেন, মণি, কত আর দেরী হবে, তোমার বাসায় বরং পৌঁছেই দিয়ে আসি।

মণি সলজ্জভাবে বলেছিল, শুধু শুধু কেন আপনি আবার উল্টো পথে গাড়ী নিয়ে যাবেন সুকল্যাণীদি! মিনিট পাঁচেকের ত ব্যাপার। এটুকু পথ হাঁটা আমার কাছে কোন সমস্যাই নয়।

আমি ত আর তোমায় কাঁধে করে পৌঁছে দিতে চাইছি না মণি। গাড়ী রয়েছে যখন বাঁকঘুরে তোমার বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে এলে—

মণি ওর কথা শেষ করতে না দিয়েই বলেছিল, সুকল্যাণীদি, আপনার আন্তরিকতার জন্য শত কোটি ধন্যবাদ। আপনাকে আর গাড়ী ঘুরিয়ে মিছে সময় নষ্ট করতে হবে না।

সুকল্যাণী মিটার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ো শিবতলার কাছাকাছি রাস্তার বাঁকে মণি'কে

নামিয়ে দিয়ে গাড়ী নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

জলধি'কে দেখেই মণি মুখে স্বভাবসুলভ হাসি ফুটিয়ে তুলে স্বাভাবিক স্বরেই বললে, জলধিবাবু যে কোথায় চললেন? এককাড়িদার ওখানে বুঝি?

জলধি বিষণ্ণমুখেই জবাব দিলে, হ্যাঁ। ভাবলুম, পায়ে পায়ে একবারটি ঘুরে আসি।

খুবই জরুরী কি?

না, তেমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয়। দু'দিন শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। কল্যাণ-সঙ্ঘের অফিসে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি, মেসেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছি। তাই ভাবলুম—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মণি বললে, হ্যাঁ, আপনাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে বটে; তা হাতে যদি কয়েক মিনিট সময় থাকে চলুন না, কয়েক মিনিটের জন্য একবারটি ঘুরে আসবেন। যদি নেহাৎ আপত্তি না থাকে এক কাপ চা অন্ততঃ—

জলধি এক গাল হেসে বললে, মণি, তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার সাধ আমার নেই, সাধ্য ত অবশ্যই নেই।

মুচকি হেসে মণি বললে, তবে চলুন, একবারটি ঘুরেই আসবেন জলধিবাবু। মণি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু অন্ততঃ বুঝেছি পুরুষ মানুষকে ঘায়েল করতে কখন কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। তাই মোক্ষম অস্ত্রটা হঠাৎ ছুঁড়ে দিলে, জলধিবাবু, চলুন ঘুরে আসবেন। আজ আবার রমেনও নেই, ডায়মণ্ডহারবার গেছে। একার জন্য এখন আর চা করতে মন চাইছে না। আপনি না গেলে হয়ত—

জলধি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মুচকি হেসে বললে, মণি, আমার জন্য তোমার বিকেলের চা খাওয়াটা পণ্ড হবে, এত বড় পাষণ্ড আমি নই।

মণি হেসে বললে, হাটুন।

মণি বাসায় ফিরে জলধি'কে চেয়ার টেনে বসতে দিল। টেবিল থেকে প্রবাসী-পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'কাপ ধূমায়মান চা নিয়ে জলধি'র কাছে ফিরে এল। একটা কাপ ওর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললে, সত্যি বলছি জলধিবাবু, আপনি না এলে আজ আমার হাতে চায়ের কাপ উঠত না। একার জন্য চায়ের ব্যাপার স্যাপারকে সত্যি বাড়তি ঝামেলা বলেই মনে হয়। কথা বলতে বলতে একটা টুল টেনে বসল।

জলধি প্রবাসীর পাতায় চোখ রেখেই ওর কথার উত্তর দিলে, হ্যাঁ, কথাটা স্বাভাবিকই বটে।

নিন, কাপটা তুলে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

জলধি চোখ-মুখের গাম্ভীর্যটুকু বজায় রেখেই চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিল।

মণি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, জলধিবাবু, যে-কথা বলার জন্য আপনাকে

ষ্ট দিয়ে নিয়ে আসা।

জলধি ঠোঁট থেকে চায়ের কাপটা নামিয়ে নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

মণি সরাসরি কথাটা ছুঁড়ে দিলে, জলধিবাবু আপনি আমায় ভালবাসেন তাই না ?

মণি'র মুখ থেকে এরকম কোন কথা তা ও আবার এত স্পষ্টভাবে শোনার জন্য জলধি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই হঠাৎ কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠল। একথার কি উত্তর দেবে হঠাৎ গুছিয়ে উঠতে না পেরে অপ্রতিভ ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মণি এবার বললে, আমি কিন্তু ভালই জানি, আপনি আমায় খুব ভালবাসেন।

জলধি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, কি করে বুঝলে, আমি তোমায় ভালবাসি ?

দেখুন জলধিবাবু, আমার বয়স নেহাৎ কম হয় নি। ইতিমধ্যে লোভাতুর চোখের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমায়। কে যোগ্য, আর কে-ই বা অযোগ্য এ প্রসঙ্গে যাব না।

অন্য দশজনের কথায় আমার দরকার নেই মণি। আমি যে তোমায় ভালবাসি, এধারণাটুকু তোমার মধ্যে জন্মাল কি করে ? এ প্রসঙ্গে কেউ কি কিছু বলেছে ?

হ্যাঁ।

জলধি একটু নড়ে চড়ে বসল। অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে এবার প্রশ্ন করলে, কে ? কে বলেছে ? কি বলেছে ?

বলেছে আপনার ওই চোখ দুটো। পুরুষের চোখ দেখে ওর মনের খবর করতে না পারি তবে মিছেই আমার এতগুলো বয়স হয়েছে। মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জলধিবাবু, রমেনকে যে-কথা বলেচি, আপনাকেও ওই একই কথা শোনাবার জন্য কষ্ট দিয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসা। দেখুন, দেশের কাজ করতে গিয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়-খাতির হয়েচে। কেউ, কোন-দিক থেকেই ওদের কলঙ্কের আভাসটুকু পর্যন্ত দিতে পারবে না।

মণি গাছে ত কত বেলই পেকে থাকে. ওতে কাকের কি লাভ ?

আমার মত বর্ণচোরা দরকচামারা বেলের দিকে কতজনকেই যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে যে দেখলুম ইয়ত্তা নেই। জিভ দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল কিনা দেখতে পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু দৃষ্টিতে লালসা মাখানো ছিল পুরো দস্তুর।

জলধি হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে গেল। ওর কথার কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে নিজেকে সংযত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

মণি এবার বললে, যে কথা বলছিলুম জলধিবাবু, আমার জানাশোনা বিভিন্ন বয়সের মেয়ে রয়েছে, যদি বলেন ত কথা বলে দেখতে পারি।

জলধি রাগে-দুঃখে-অপমানে গজ গজ করতে করতে বললে। মণি, আমি বরং এখন

উঠি, অনেক কাজ আছে।

না, ক'দিন ধরেই ভাবছি, আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে ক'টা কথা বলব।

শেষ পর্যন্ত এরকম সব অবান্তর কথা জুড়ে—

মণি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, জলধিবাবু, আপনার কাছে যা অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে, আমার কাছে তা-ই একান্ত প্রয়োজনীয় মনেও ত হতে পারে। এমন সুযোগ হয়ত শিগ্‌গির—

জলধি আবার বসে পড়ল। হাতের ছাতাটাকে চেয়ারের হাতলের সঙ্গে আবার ঝুলিয়ে দিল।

মণি বললে, ঠিক আছে, অহেতুক প্রসঙ্গকে দীর্ঘ করে আপনার বিরক্তির কারন হব না, কথা দিচ্ছি। যাক, যে-কথা বলতে চাইছি, মাঝে মধ্যেই ভাবি, আপনারা পুরুষ-মানুষগুলো সত্যই কি অন্ধ!

জলধি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জ্ঞানীজনরা ত তা-ই বলেন, প্রেম মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

ঠিক তা-ই। কথা বলতে বলতে মণি জানালার কাছে এগিয়ে গেল। বাইরের নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলে, সত্যই অন্ধ। আপনার আর রমেন-এর মত অনেকেই অন্ধ জলধিবাবু। নইলে আমার মুখের পুরুষালি ভাব, আনারী সুলভ মোটা কণ্ঠস্বর দেখেও আমার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে এতটুকুও আঁচ করতে পারেন না! তারওপর মেদ-মাংসের বাহুল্যবর্জিত এ-দীর্ঘ ছন্দের চেহারাটা দেখেও কি কোনদিন আমার সম্বন্ধে মনে কোন রকম কৌতূহলের উদ্রেক হয় নি?

জলধি অতুগ্র আগ্রহের সঙ্গে মণি'র কথাগুলো শুনতে লাগল।

মণি ব'লে চলল, জলধিবাবু, যে-কথা অনেক আগেই আমার বলা উচিত ছিল, আজ আমার সে দুর্ভাগ্যের কথা সবই একে একে বলব। আমার দিক থেকে সব কিছু খোলাখুলি বলা উচিত। আপনারও শোনা দরকার বলেই মণে করি। জলধিবাবু, আমার জন্মলগ্নেই দেবতারা আমার ওপর অপ্রসন্ন ছিলেন। নইলে মানুষের প্রেমের মর্যাদা দেবার মত সামান্যতম সম্পদও আমার নেই। যে-সম্পদ থেকে বিধাতাপুরুষ নির্মমভাবে আমায় বঞ্চিত করেছেন, আপনারা আমার কাছে তা-ই প্রত্যাশা করেন, হাত পাতেন। নিজের রিক্ততার যন্ত্রণার চেয়েও আমার অসহায়ত্বের ব্যথাটুক আমায় বেশী করে পীড়া দেয়। জলধিবাবু, সে যে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণা, কী মর্মান্তিক জ্বালা ভাষায় বুঝানোর মত ভাষা আমার নেই। কথা বলতে বলতে মণি'র কন্ঠস্বর ক্রমেই ভারী হয়ে আসতে লাগল, দু'চোখের কোণে ভিড় করল জলবিন্দু।

জলধি বিস্ময় প্রকাশ করে ব'লে উঠল, মণি, তুমি কাঁদছ!

কারো মুখে হাসি ফোটাবার সামর্থ্য থেকে যখন বঞ্চিত, কেঁদে বুক ভাসানো ছাড়া যে অন্য কোন পথ আমার জন্য খোলা নেই জলধিবাবু। তারপর যে-কথা বলছিলুম,

পুরুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করে কাজের প্রেরণা যোগানোই নারীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অন্ততঃ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা একথাই বলে। সাধ্য থাকলে আমিও আপনার বা রমেন-এর ভালবাসার মূল্য দিতে ছুটে যেতুম। নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তিলোত্তমা হতুম। কিন্তু সে-সাধ থাকলেও তিলমাত্র সাধ্যও আমার নেই, বিশ্বাস করুন।

জলধি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে মণিমালার দিকে তাকিয়ে রইল। অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে এবার বললে। মণি, পাগলের মত তখন থেকে কী সব বলে যাচ্ছ, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছি নে! আমায় না হয় বঞ্চিত করলে, কিন্তু রমেন, এককড়িদা কারো কাছেই কি কোনদিন ধরা দেবে না? চিরদিনই কি এমন আলেয়ার মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে মণি?

ঐ যে বললুম, প্রেম মানুষকে সত্যই অন্ধ করে দেয়। বললেও শোনে না, বুঝালেও বুঝতে চায় না। কি করে যে আপনাদের অন্ধত্ব ঘুচাই বুঝছি না!

মণি, একটু খোলসা করে বলো, আমি যে আমার ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব তোমারই—

জলধি'কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মণি ব'লে উঠল, জলধিবাবু, বলতে পারেন, পৃথিবীতে এমন কোন্ যুবতী রয়েছে, যে পুরুষের বাঁকা-চোখের চাহনি, একটু ভালো-বাসার প্রত্যাশায় লালায়িত নয়? এমন কোন মেয়ে কি রয়েছে, যে পুরুষের একটু খোসামোদ, একটু আধটু পিছনে লাগা পছন্দ করে না? কিন্তু আমি এসব এড়িয়ে চলতেই বেশী উৎসাহী। কিন্তু কেন? অন্য দশটা মেয়ের মত আমার দেহটাও কি রক্ত-মাংসে গড়া নয়? আমার বুকের ভেতরটা কি তবে নিরেট পথর দিয়ে তৈরী? তা ও ত নয়। তবে কেন আমি পুরুষ মানুষ থেকে নিজেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতেই বেশী উৎসুক? কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে অপেক্ষা করে মণি এবার বললে, থাক। আমি জানি একথার উত্তর আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। আমিই বলছি শুনুন জলধিবাবু।

ওকে থামিয়ে দিয়ে জলধি বললে, থাক, আমার আর শুনে কাজ নেই মণি। তোমার পাঁচালি শোনার মত সময় ও ধৈর্য—কোনটাই আমার নেই। ছাতাটা হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে এবার বললে, তোমার কুম্ভীরাশ্রুতে বরং রমেন আর এককড়িদাকে ভোলাতে চেষ্টা কোরো। আমার হাতে অনেক কাজ। আমি চললুম।

মণি যন্ত্রচালিতের মত জানালার কাছ থেকে ছুটে এসে জলধি'র পথ-আগলে দাঁড়িয়ে বললে, না, জলধিবাবু আপনি যেতে পারবেন না। আমার সব কথা না শুনে আপনার যাওয়া চলবে না। কিছুতেই যেতে পারবেন না।

জলধি অসহায়ভাবে ধপাস্ করে বসে বল্লে, এক ঝকমারীতেই না পড়া গেল রে বাবা! এসে দেখছি, গরু-চোরের মত বেঁধে পিটতে চাইছে! এবার মণি'র দিকে মুখ তুলে বললে তবে তোমার মোদ্দা কথা ত এটাই, কাউকে বিয়ে করবে না কোনদিন, এই ত? আমায় যদি না-ই কর, তবে রমেন বা এককড়িদা কাউকেই নয়?

জলধিবাবু, আজ আমার বিষময় জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলার জন্যই ধরতে
লে একরকম জোর করেই আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনি, রমেন বা এককড়িদা
মায় ভুল বুঝবেন, এটা আমার দিক থেকে অসহনীয় বলেই না আপনাকে এ-কষ্ট
য়া। যে-অন্তর্জ্বালার কীট আমার ভেতরটাকে দিনের পর দিন [redacted] কুড়ে কুড়ে
চ্ছে, ক্ষয়-কাশের রোগীর মত ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, তা বলে নিজেকে হাল্কা করতে না
রলে আমি যে অচিরেই পাগল হয়ে যাব জলধিবাবু। বিশ্বাস করুন, আমি পাগল
য়ে যাব! আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে আপনার অমূল্য সময়ের কয়েকটা
নিট ভিক্ষে দিয়ে আমায় বাঁচান, আমার বাঁচার প্রেরণা দান করুন।

জলধি ছাতাটা আবার পূর্বের স্থানে ঝুলিয়ে রেখে একটু নড়েচড়ে বসে বললে,
ক আছে, বল কি বলতে চাইছ, বল শুনি।

মণি আঙুল দিয়ে কাপড়ের আঁচলটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, শুনুন
লধিবাবু, ভেবেছিলুম আকার ইঙ্গিতেই আমার অশান্ত যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কথা
পনাকে বুঝাতে পারব। কিন্তু আমি ভাষার মাধ্যমে হয় বুঝাতে পারছি না,
হয় আপনি বুঝেও না বুঝার ভান করছেন। এমতাবস্থায় খোলসা করে বলা ছাড়া
ন্যান্তর নেই। আচ্ছা জলধিবাবু আপনারা সবাই কি সত্যই ছেলে মানুষ। কামাবস্তুর
ঠিক স্বরূপ না জেনেই পাওয়ার তপস্যায় একেবারে বিভোর হয়ে পড়লেন! দেখুন
লধিবাবু আপনাদের কেউ-ই আমার আত্মপরিচয় জানেন না।

কেন? রমেনও জানে না?

না, রমেন, এককড়িদা বা আপনি—কেউ-ই না। শুনেছি, রমেন ত তোমার
লেবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে তোমায় চেনে। তোমার গৃহশিক্ষকও ছিল বেশ
ছুদিন।

হাঁ, তা ছিল বটে। যাক, যে কথা বলছিলুম—আপনাদের কি চোখ নেই জলধি-
বু? দেখতে পাচ্ছেন নাকি আমার মুখে, চেহারায় একটা পুরুষালি ছাপ সুস্পষ্ট?
খতে পাচ্ছেন নাকি আমার মুখে অসংখ্য বলিরেখা, অসংখ্য রোমশ? আর দেখতে
চ্ছেন নাকি আমার চালচলন—চলাফেরা অনেকটা পুরুষেরই অনুরূপ। আর এ-ও
লক্ষ্য করেন নি কোনদিন নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে
রুষের সংস্রব এড়িয়ে চলাতেই বেশী উৎসাহী?

জলধি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে মণির দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

মণি মুখে বিষন্নতার হাসি ফুটিয়ে তুলে বললে, কি আমার প্রকৃত পরিচয় কিছু
নুমান করতে পারছেন? জলধি'কে নির্বাক দেখে মণি আবার বলতে লাগল, বিশ্বাস
ন জলধিবাবু, আমি আসলে স্ত্রীও নই, পুরুষও নই, ক্লীব।

জলধি যেন আচমকা একটা হোঁচট খেল! সচকিত হয়ে চোখে-মুখে অবিশ্বাসের
প এঁকে মণির দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল, মণি!

মণি ব'লে চলল, কি কথাটা খুবই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তাই না জলধিবাবু?

আরও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, এত বড় একটা ব্যাপার কি করে চাপা পড়ে রইল যে, এমন কি রমেন-এর অগোচরেও রয়ে গেল! অতি শৈশবে পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ কেউ অবশ্য জানত না। মা'র একমাত্র সন্তান বলেই হয়ত সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাপারটাকে দেখেছিল, আমার ক্লীবত্বের কথাটা নিয়ে মোটেই কানা ঘুষো করেন নি। আমার বাবা ছিলেন গান্ধীজী'র অনুগামী। স্বরাজ দলের সঙ্গে ছিল ওর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। বছরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই কাটাতেন বাড়ির বাইরে। কাজের তাগিদে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন। নতুবা পুলিস পুঙ্গবদের দয়াদাক্ষিণ্যে জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে কাটাতে হ'ত ওঁকে।

বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে এবার বললে, আমার মা, হাঁ আমার মা-ই বাল্যে ও কৈশোরের দিনগুলোতে বুকে আগলে রেখেছিলেন ওর একমাত্র আনন্দের টুকরোকে। অবশ্য আমি আবারও বলব, আমাদের প্রতিবেশীদের সক্রিয় সহযোগিতার এতটুকুও ঘাটতি থাকলে আমার আজ স্থান ২/৩ ডায়মণ্ডহারবারের ওই হিজরে—পল্লীতে। ঢোলকের তালে তালে নেচে কেঁদে হেড়ে গলায় সুলুক, ছড়াগান, রঙ্গরসের কথা বলে আর কতরকম ঢঙঢাঙ করে পর মুখাপেক্ষী হয়ে নিকৃষ্টতম জীবন যাপন করতে হ'ত জলধিবাবু। কিন্তু আজ? আজ আমি সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি দশজনের সঙ্গে নির্বিবাদে মেলামেশা করছি, নির্দ্বিধায় একাসনে বসে আহার করছি। এক কথা সমাজের সর্বত্র আমার অবাধ গতি। এ কী কম সৌভাগ্যের ব্যাপার জলধিবাবু।

জলধির ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মণিমালা বলে চলল, আজ ডায়মণ্ডহারবারের ওই হিজরে পল্লীর পরিবর্তে আমার স্থান হয়েছে ভদ্র-সমাজে, আপনাদের মত জ্ঞানী-গুণী-সম্মানীয় ব্যক্তিদের মাঝে। আর ঢোলকের পরিবর্তে আমার হাতে উঠেছে তেরঙা ঝাণ্ডা আর নিজে ঘৃণা অবহেলিত জীবন যাপন না করে করতে পারছি অবহেলিত-নির্যাতিত নারী জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য আন্দোলন, এ কী কম সৌভাগ্যের কথা জলধিবাবু! নিজের দৈহিক খুঁতের জন্য আমি যত না অনুতপ্ত তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী আনন্দিত নিজের জীবনকে পরহিতার্থে উৎসর্গ করতে পেরে।

জলধি উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল, চুপ কর। চুপ কর মণি! আমি আর সহ্য করতে পারছি না! উঃ আমার মাথায় কে যেন আচমকা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে উঃ কী দুঃসহ যন্ত্রণা!

ম্লান হেসে মণিমালা বললে, আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনেই আঁৎকে উঠছেন, যন্ত্রণায় দগ্ধে মরছেন জলধিবাবু! আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমার আবাল্য সঞ্চিত যন্ত্রণাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একবারটি ভেবে দেখুন ত, কী মর্মান্তিক জ্বালায় প্রতিনিয়ত জ্বলে পুড়ে মরছি আমি! দুঃসহ দহন আছে, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ নেই। যন্ত্রণাকে উস্কে দেয়ার লোকের অভাব নেই, কিন্তু সান্ত্বনা দেয়ার কেউ-ই নেই

সংসারে। আর জীবনে চলার পথের প্রতি পদক্ষেপে প্রলোভনের হাতছানি আছে, কিন্তু এমন একজন মনের মানুষ নেই যার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলে বুকটাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হাল্কা করতে পারি। কথা ক'টা বলেই মণিমালা জানালার শিক ধরে ডুকড়ে ডুকড়ে কাঁদতে লাগল।

জলধি চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে মণিমালার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, মণি! বোন আমার! জীবনে চলার পথে যদি কোনদিন তোমার উপকারে লাগতে পারি নির্দ্বিধায় জানাবে।

মণিমালা যন্ত্রচালিতের মত পিছন ফিরে জলধি'র মুখোমুখি দাঁড়াল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, জলধিদা আজ আমি নতুন জীবন পেলুম; নতুন করে পেলুম বেঁচে থাকার প্রেরণা।

জলধি ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললে, মণি তোমায় আমি চেয়েছিলুম অন্যভাবে, অন্যরূপে। আজও চাচ্ছি তবে বোনরূপে। আমার হারিয়ে যাওয়া বোনকে যেন আমি নতুন করে বুকে পেলুম। মণি, আমার একটা অনুরোধ—

ওকে থামিয়ে দিয়ে মণি বললে, অনুরোধ নয় দাদা, বলুন আদেশ।

হাঁ, তোমার প্রতি আমার আদেশ রইল, সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে যেন আমার কাছে ছুটে এসো বোন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রমেন ডায়মণ্ডহারবারে এসেছে। ইংরেজ সরকারের ঘাঘু গোয়েন্দা পুলিসরা গঙ্গার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। ক'দিন আগেই অস্ত্রশস্ত্র সমেত একটি জাহাজ ধরা পড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে ইলিশ-মাছ ধরার অজুহাতে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা গঙ্গার বুকে মিটমিটে আলো জেলে জাল হাতে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় অদূরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ ওদের কানে গেল। উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা লক্ষ্য করতে লাগল। নিঃসন্দেহ হ'ল, দাড় টানার শব্দই বটে। এমন সময় গোয়েন্দা পুলিসের নৌকো থেকে অতি শক্তিশালী দু-দু'টো টর্চ এক সঙ্গে জ্বলে উঠল। আর গর্জে উঠল, কে যায়? নৌকো ভেড়াও, নইলে গুলি করব, বলে দিচ্ছি!

টর্চের আলোয় দুটো পুরুষ-মূর্তিকে অতর্কিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখা গেল।

গোয়েন্দা-পুলিসের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, তোমরা যে-ই হও নৌকো ভেড়াও। সাবধান! পালাবার চেষ্টা কোরো না, গুলি করব!

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। দু-দু'জন লোক অন্ধকারের বুক চিঁড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল গোয়েন্দা পুলিসের বন্দুক। ব্যর্থ প্রয়াস।

ওরা অস্ত্রশস্ত্রসহ নৌকোটা পেল বটে। কিন্তু বিপ্লবীদের টিকির নাগালও পেল না। ওরা ডুব সাঁতারে কোনদিকে ধাওয়া করেছে, অন্ধকারে চিৎ-সাঁতারে কোথায় মরার মত ভেসে আছে, পুলিস পুঙ্গবদের সাধ্য কি হদিস পায়।

দিনের বেলায় ওরা দু'জন অন্ধ সেজে পথে পথে ভিক্ষে করে। পথের ধারে ঝুপড়ি-ঘরে বাস করে। রাত্রির অন্ধকারে শুরু হয় ওদের অভিযান।

ওদের সুপ্রশস্থ উত্তাল উন্দাম নদীপাড়ি দিয়ে মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের কাছ থেকে নানা লুঠকরা বন্দুক ও গোলাবারুদ নৌকো করে এপাড়ে নিয়ে আসতে গিয়েই বিপত্তিতে পড়তে হয়েছিল। তবে এটুকুই শান্তনা বন্দুকের গুলিগুলি দু'জনের কোমড়ে বাঁধা ছিল, বে হাত হয় নি।

খেয়া-ঘাটের অদূরবর্তী একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের নীচে রমেন নকল-অন্ধ বিপ্লবীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় একটা লাঠির দুই প্রান্ত ধরে পথ হাতড়ে হাতড়ে অন্ধ-বিপ্লবী দু'জন রমেন-এর কাছে এল। অন্ধ দু'জনের মধ্যে একজনের নাম গণেশ আর দ্বিতীয়জন বিমল। উভয়েরই বয়স ত্রিশের কিছু বেশী। পরণে ময়লা-ছেঁড়া ধুতি গায়ে তেলচিটে পড়া ছেঁড়া দুটো হাফ সার্ট।

গণেশ আর বিমলকে দেখেই রমেন ব্যস্ত-পায়ে ওদের কাছে এগিয়ে গেল। বিমল শক্ত একটা কাঠির সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হাতের বাঁশের লাঠিটির মাথার মাটি সরিয়ে ছিদ্র থেকে একচিলতে দোমড়ানো কোঁচকানো চিরকুট বের করে রমেন-এর হাতে দিল।

রমেন কাগজটার ভাঁজ খুলে বক্তব্য পড়তে লাগল। মণির উদ্দেশ্যে লেখা একটা ছোট্ট চিঠি। মণি পর পর ক'দিন রমেন'কে নিয়ে গণেশ আর বিমলের কাছে এসেছিল। ওদের সঙ্গে রমেন-এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাই বিমল মণির চিঠি রমেন-এর হাতে দিতে দ্বিধা করল না। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংস্থা থেকে চিঠিটা পঠানো হয়েছে। চিঠির সম্বোধনে কারো নাম উল্লেখ নাই, এমন কি শেষেও কারো নাম স্বাক্ষর নাই। উভয় স্থানেই দুটো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির মূল বক্তব্য, গোসাবা খেয়া-ঘাটের অদূরবর্তী পুরনো বট গাছের নীচে নৌকো অপেক্ষা করবে। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর বা সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকে নৌকায় অবস্থানরত বিপ্লবীর হাতে যেন তুলে দেয়া হয়। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা রয়েছে, নৌকোর মাঝি বা অপেক্ষমান বিপ্লবীরা খুবই বিশ্বস্থ।

গণেশ ও বিমল আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে রমেন'কে নিয়ে নদীর ধারের এক ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। ঝাঁকড়া গাছ আর লতাপাতায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছেয়ে রেখেছে। গণেশ আর বিমল প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে-ঝোপের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। রমেন কিছুটা এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ইতিপূর্বে ও এখানে আর আসে নি। মণির অবশ্য এসব গোপন আস্তানা গণেশ ও বিমলের মতই নখদর্পণে। নারী-কল্যাণ-সমিতির জরুরী কাজ থাকায় আজ রমেন'কে আসতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। চতুর্দিকে আলো-আঁধারীর খেলা চলছে।

অপরিচিত অন্ধকার ঝোঁপের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে রমেন, কে বুনো মশার কামড় হজম করতে হচ্ছে। আওয়াজ করে মশা মারতে বা তাড়িয়ে দিতেও ভরসা হচ্ছে না। বলা ত যায় না ধারে কাছে কেউ ঘাপটি মেরে বসে থাকাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ঝোঁপের মধ্যে অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে নীরবে এক ঝাঁক মশাকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করাও রমেন-এর কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধৈর্যের পরীক্ষাও বটে। প্রায় আধঘণ্টা পরে গণেশ ও বিমল একটা জীর্ণ খাটিয়া নিয়ে বেরিয়ে এল। খাটিয়ার ওপর ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল দিয়ে এমন করে অস্ত্রশস্ত্র ঢেকে দেয়া হয়েছে যেন শবদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন সুন্দর করে খাটিয়াটাকে সাজানো হয়েছে যেন বলে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না এর মধ্যে মৃতদেহের পরিবর্তে রয়েছে বন্দুক আর গোলা বারুদ।

গণেশ ও বিমল ধরাধরি করে খাটিয়াটাকে ঝোঁপের বাইরে নিয়ে এল।

গণেশের দেশলাইয়ের আগুনের সংকেত পেয়ে আরও দুইজন দরিদ্র চাষীর বেশধারী মাঝ-বয়সী বিপ্লবী নিঃশব্দে ওদের কাছে এগিয়ে এল। কারো মুখে টু-শব্দটি পর্যন্ত নেই।

রমেন ওর জুতোর ভেতর থেকে মণি'র লেখা একটা চিঠি বের করে আগন্তুক চারজনের মধ্যে সব চেয়ে বয়স্ক গাট্টাগোট্টা লোকটার হাতে গুঁজে দিল। চারজন বাহক হরি-ধ্বনি দিতে দিতে খাটিয়াটাকে কাধে নিয়ে মাতলা নদীর দিকে এগোতে লাগল। চাষীভুষোদের মৃতদেহের সঙ্গে রমেন-এর মত ব্যক্তির এক্ষেত্রে সঙ্গদান করাও রীতিমত সন্দেহজনক ব্যাপার। তাই বাধ্য হয়ে ওকে পোষাক পরিবর্তন করে, মুখে সামান্য কিছু মেক-আপ ব্যবহার করে বাহক চারজনের সমগোত্রীয় কোন ব্যক্তির সাজে সেজে নিতেই হ'ল।

রাত্রির অন্ধকারে ওরা পাঁচজন হরি-ধ্বনি দিতে দিতে মাতলা নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা একফালি চাঁদ এতক্ষণ তবু হাল্কা আলো ছড়িয়ে রেখেছিল। এমন কালো মেঘের আড়ালে সেটুকুও গা-ঢাকা দিল। চারদিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। বিপ্লবীদের সামনে এখনও আড়াই ক্রোশ পথ! অন্ধকারের অজুহাত দেখিয়ে কাজে শৈথিল্য প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র সুযোগও নেই। তাই তারা বৃষ্টি নামার ভয়ে লম্বা লম্বা পায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল। যেকোন ভাবে মধ্য রাত্রির আগেই মাতলা-নদীর তীরে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দিতেই হবে। নইলে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে। চারদিকে ইংরেজদের পোষ্যপুত্র টিকটিকির দল যেভাবে চক্কর মেরে বেড়াচেছ যেকোন সময় বামাল সহ হাতে নাতে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যস, অস্ত্রশস্ত্র ত দেবতার ভোগে লাগবেই, আর বিপ্লবীদের প্রত্যেকের অন্ততঃ বছর

পাঁচেক জেল যে হবে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও থাকতে পারে না।

রমেন-এর কাছে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত পথ। সংস্কারের অভাবে যেখানে সেখানে ছোট-বড় কত সব গর্ত তৈরী হয়ে রয়েছে। গ্রাম্য পথে হাঁটায় রমেন-এর অনভ্যস্ত পা দুটো অন্ধকারে বার বার হোঁচট খেতে লাগল। খোড়ার পা' খানায় পড়ার একটা প্রবণতা থাকে।

রমেন সহযাত্রীদের পদশব্দ অনুসরণ ক'রে ক'রে অন্ধকারে কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে অপরিচিত কণ্ঠ হঠাৎ গর্জে উঠল, দাঁড়াও! খবরদার এক পা-ও এগোতে চেষ্টা করবে না। সঙ্গে সঙ্গে টর্চের অত্যুজ্জ্বল আলো ওদের ওপর এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।

বিমল কণ্ঠস্বরকে লক্ষ্য করে বললে, তুমি কিডা গো, অমন হেড়ে গলায় দাঁড়াতি কতিছ? কথা শুনে মনে হতিছে যেন তোমার বাপের তালুকে বাস করি!

বিমল-এর কথা শেষ হতে না হতেই পুলিসের উর্দিপরা দু'জন লোক ছুটে এসে ওদের পথ আগলে দাঁড়াল, একজন গোয়েন্দা-পুলিসের ইন্সপেক্টর ভজহরিবাবু আর দ্বিতীয়জন এক হাবিলদার।

ভজহরিবাবুর এক হাতে একটা পিস্তল বাগিয়ে ধরা, আর অন্যহাতে জ্বলন্ত টর্চ লাইট। তিনি বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললেন, এত রাত্রে মরা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

গণেশ নির্ভিক কণ্ঠে জবাব দিলে, ভাবতিছি একবারটি দক্ষিণ-গাঁয়ের হাটে যাব। কাক ডাকা সকালে হাট বসে কিনা তাই একটু পা-চালিয়ে—

ওর মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে ইন্সপেক্টর ভজহরি ধমক দিয়ে উঠলেন, চুপ কর! ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাস নি হারামজাদা ছোটলোক কোথাকার! মরা নিয়ে হাটে যাচ্ছিস, তাই না?

গণেশ তেমনি নির্ভিক কণ্ঠে জবাব দিলে, ইয়ার্কি মারলুম কোথায় কর্তা! আপনি যেমন কইলে মরা নিয়ে কোথায় যাতিছস মরা নিয়ে লোকে কোথায় যায়, আপনিই কও দেখিনি?

বলব না? শ্মশান রইল পিছনে পড়ে আর তোরা কিনা মরা নিয়ে উল্টোদিকে ছুটছিস। ব্যাপারটা কেমন হ'ল না?

আগ বাড়িয়ে বিমল বললে, গোঁসা করবেন না পুলিস বাবা। ওর কথাবার্তার ঢঙঢাঙই অমন ধারা তিড়িক্কি মেজাজ। লোককে মান্যি করে কথা কইতে জানে না। হাঁ, ব্যাপারটা অবাক মানার মতই বটে। শ্মশান ফেলে মরা নিয়ে উজানে যাতিছি. আপনি ত ঠিকই করেছ।

তবে?

অদেষ্টের ফের পুলিস বাবা! অদেষ্টের ফের না হলে অমনটা হয়! উনি

মরলেন না ত, মোদের মাইরে গেলেন!

কেন, কি হয়েছে?

কি হয়েছে তা মোদের হাল দেখে আপনি ঠাহর পাত্তিছ না! দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দিতেই গা দিয়ে ঘামের জোয়ার বইত্তিছে। এখনও সুমুখে তিন ক্রোশ গেলে তবে মরার শেষ সাধ মিটবে গো পুলিস বাবা।

তোদের কথাবার্তা সবই কেমন যেন হেঁয়ালিতে ভরা। পরিষ্কার করে বল ত আসল ব্যাপারটা কি?

বিমল বললে, আসল ব্যাপার শুনলি আপনিই অবাক মানবে গো পুলিস বাবা। তবে কত্তিছি শোন, উনি ত মরলেন। মরার আগে শেষ বাসনা জানালে, মোর এক বুড়ি পিসিমা রইছেন। জন্ম দিতে যাইয়ে মা মারা গেলে পিসিমাই নাকি ওকে কোলে-পিঠে করে লায়েক করে তোলেন। বললে, মোরে শ্মশানে নেয়ার আগে তেনারে একবারটি দেখাবা। ওই বুড়ির বয়স নাকি পাঁচ কুঁড়ি ধরে ধরে। বেঁকে চুড়ে দলা পাকিয়ে গেছে, এক্কেবারে নাড়ুবড়ি অবস্থা! কও দেখিনি, কী ঝকমারিতেই না পড়া গেসরে বাবা!

তা তোমরা ত পাঁচ ক্রোশ পথ মরা টেনে না নিয়ে বরং বুড়িকে নিয়ে এসে দেখিয়ে নিয়ে গেলেই পারতে। এতেই বরং ঝক্কি ঝামেলা কম হ'ত।

মনে ভরসা জাগল না পুলিস বাবা।

কেন?

শেষ পর্যন্ত যদি বুড়ি মেরে খুনের দায়ে পড়তে হয়। পাঁচ কুড়ি বয়েস হয়েছে। তার ওপর নাড়ু-বড়ি পাকিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখা যেত, মড়াকে দেখাতে এসে বুড়িই মাঝ-পথে টেঁসে গিছে। তখন? তখন ঠ্যালা সামালাবি কিডা?

হাঁ, কথাটা একদিক থেকে ঠিকই বলেছ বটে।

রমেন ইতিমধ্যেই পথের ধারে কপালে হাত দিয়ে বসে অনবরত হাঁপানি রোগীর মত হাঁপাচ্ছে আর থেকে থেকে কাশতে শুরু করেছে। বিমল ওর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, তার ওপর তেনার ব্যাপারটা ত রয়েই গেছে পুলিসবাবা। হাঁপানি রোগে এমনিতেই কষ্ট পাত্তিছেন। তার ওপর পথের ধকল ত আছেই। ব্যস, কিছুটা পথ হাঁটতে না হাঁটতেই হাঁপানির টান গেল বেড়ে। এখন আপনিই কও দেখি নি কাকে সামলাই? মরা ফেলে রোগী সামলাতে গেলে, বাসি মরা হবে। পঁচে ঢোল হবে। শেয়ালে টানাটানি জুড়ে দেয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

পুলিস-ইন্সপেক্টর ভজহরিবাবু বললেন, তোমরাও চরম বোকামি করেছ হে! গাঁয়ে কি আর লোকজন কেউ ছিল না। অমন একজন রোগীকে সঙ্গে না আনলেই কি চলছিলই না হে!

কথাটা ঠিকই কইছেন পুলিসবাবা! কিন্তু গতিকও ত কিছু ছিল না। ওরই বাবা মরেছেন কিনা। বুড়োর একমাত্র ছেলে। মোরা ত আর পাঁচ ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে

আবার মরা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। হিঁদুর মরা, পোড়াবার সময় মুখে আগুনের একটা ব্যাপার আছে না?

হাঁ, সে-কাজত ছেলেকেই করতে হয়।

তবেই আপনি ভেবে দেখ, ফ্যাসাদ কোথায়! মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বিমল বললে, একটা কথা কব পুলিসবাবা?

কি? কি বলছিস?

কইছিলাম কি, মোদের দুর্গতি ত আপনি নিজের চোখেই দেখতিছ। লোকের উপকার করলে ত পরকালের কাজ হয়, পুণ্যি সঞ্চয় হয় শুনেছি। আপনার সঙ্গের ওই সিপাইবাবাকে দাও না, মোদের রোগাঁটারে ধরে একটু সাতগাঁয়ে পেঁছে দিয়ে আসুক। ভয় নেই, মরা বইতে হবে না।

ইন্সপেক্টর ভঞ্জহরি আঁৎকে উঠে বললেন, সে কী কথা হে! বলিহারি তোদের আব্দার! আমরা সরকারী কাজে এখানে পাহারায় নিযুক্ত। স্বদেশী-গুণ্ডাদের ওপর নজর রাখছি? আর ডিউটি ফেলে যাবে পারকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে! পাগল কোথাকার! মাথার দোষ না হলে কেউ অমন কথা!

বিমল কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে বুঝেছি পুলিসবাবা, গরীবের জন্য চোখের জল ফেলার কেউ নেই! তেলমাথা হলে তেমন তেলের বাটি নিয়ে ছুটে আসার লোকের অভাব হ'ত না। এবার পথের ধারে বসে থাকা রমেনকে লক্ষ্য করে বললে, কইহে, কষ্ট করে কোনরকমে যেটা পার টুকটুক করে চল। অদেষ্টের ফের ত এড়াতে পারব না। এরা তিনজনেও ত আবার মরা বইতে পারবে না। নইলে আমি না হয় তোমায় কাঁধে চাপিয়ে নিতুম।

রমেন হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল।

বিমল বললে, চলি গো পুলিসবাবা, দেখা থাক বরাতে কি লেখা রয়েছে।

বিপ্লবীরা কয়েক পা এগিয়ে গেলে ইন্সপেক্টর ভঞ্জহরি ওদের ফেলে যাওয়া জমাটবাঁধা অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে হতাশার স্বরে সঙ্গের সিপাহীকে লক্ষ্য করে বললে, যা বাবা! চাষীগুলো আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল না ত? কিরে কেষ্ট, এদের ব্যবহারে ছলচাতুরি কিছু বুঝলি? বিপ্লবীদের বিশ্বেস নেই। ওরা কখন যে কি ভেক ধরে পুলিসের বাপের সাধ্য কি—

সিপাহী কেষ্ট তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বললে, স্যর, আপনার মত একজন ঘাঘু পুলিস-অফিসারকে ধোঁকা দেবে ওই নিরক্ষর চাষীভুষোগুলো! অসম্ভব!

ইন্সপেক্টর ভঞ্জহরি সিপাহী কেষ্ট'র মুখে নিজের কর্মদক্ষতার প্রশংসা শুনে হাওয়া ভরা বেলুনের মত ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেলেন। হাতের টর্চটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, সন্দেহ করার মত কিছুই ত নজরে পড়ল না। নইলে অবশ্যই কাঁথা কম্বল সরিয়ে দেখতুম, সত্যই মরা নিয়ে যাচ্ছে, নাকি—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কেষ্ট বলে উঠল, ঠিকই করেছেন স্যর। নইলে ব্রাহ্মণ

মানুষ দুপুর রাত্রে মরা ছুঁলে আবার স্নান করার হাঙ্গামা করতে হ'ত।

আরে, ওটা ভেবেই ত আমি আর গা করলুম না। নইলে ভাল ক'রে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেবার পাত্র আমি!

তা যা বলেছেন স্যর। আমি সবেমাত্র খাটিয়াটার দিকে এগিয়ে ছিলুম। স্নানের ব্যাপারটা না থাকলে ঘাটাঘাটি করে দেখতুম একবারটি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রমেন মণিমালার বাসায় ফিরে এসেছে। মণি নারী-কল্যাণ-সমিতির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সামনে সমিতির বার্ষিক অধিবেশন। দেশের নানা জেলা থেকে প্রায় শতাধিক ডেলিগেট আসার কথা। সাতদিন ধরে অধিবেশন চলবে। অধিবেশনের হাজারো কাজের ঝামেলা ছাড়াও বাড়তি একটা ঝামেলা রয়েছে। বাইরে থেকে যেসব ডেলিগেট আসার কথা ও'দের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদি করতে হবে। আর অধিবেশনের অন্যান্য কাজ ত রয়েছেই।

সুকল্যাণী মিটার নারী-কল্যাণ-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই নেতৃত্বে সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। মণিমালা এ-সংস্থায় নতুন এসেছে। ধরতে গেলে ওর ওপর তেমন কোন গুরুদায়িত্ব বর্তায় নি। তাই ওকে অধিবেশনের ব্যাপারে তেমন মাথা না ঘামালেও চলে। ওর ওপর মুখ্যতঃ দায়িত্ব বর্তেছে, একটা omnibus resolution মুভ করতে হবে। সুকল্যাণী মিটার-এর গোড়া থেকেই এটা হচ্ছে। মণি প্রস্তাবটা শুনেই আপত্তি করেছিল। এতে বিবাহবিচ্ছেদ থেকে শুরু করে চাকরি ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মাইনে সমহার ধার্য করা পর্যন্ত নানা দাবীর উল্লেখ থাকবে।

'বিবাহ বিচ্ছেদ'-এর দাবীর কথা শুনেই মণি হেসে গড়াগড়ি গিয়েছিল। সে হাসতে-হাসতে সেদিন ওর বান্ধবী এনা ও হেনা'কে লক্ষ্য করে বলেছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী আমার দ্বারা পেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয় ভাই।

এনা চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এ'কে বলেছিল, কেন? অসুবিধে কোথায়?

কী বলছ তোমরা! অসুবিধে ত গোড়াতেই রয়েছে ভাই। আমার যে সুন্দর চেহারা! কেউ বিয়ে করলে যে বর্তে যায়, তারই মুখ দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী রাখা কি সম্ভব, নাকি উচিত, তোমরাই বল? আমায় আর যা বলবে সবেই রাজী। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে।

এনা ও হেনা দুই বোন ওর কথার এতটুকুও গুরুত্ব দেয় নি। ওরা বরং হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

রমেন দুপুরের পর কোথায় যেন জরুরী কাজে বেরিয়েছে। ফিরতে ঘণ্টা খানেক দেরী হবে বলে গেছে। দু'-তিনদিনের মধ্যেই ওকে আবার ইওরোপে ফিরে যেতে হবে। যাবার আগে এখানকার বিভিন্ন ঘাটিতে গিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেতে

চাচ্ছে। ওর একার পক্ষে ত আর দেশের সর্বত্র ছুটোছুটি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া নিরাপদও নয়। গোয়েন্দা-পুলিস চারদিকে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। যেকোন সময় বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। বিপদ পায়ে পায়ে। তবে বিপদের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকাও ত সম্ভব নয়। বিপদ মাথার ওপর নিয়েই ত বাংলা-মায়ের এরকম হাজার হাজার দামাল ছেলে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছে। মৃত্যুকে এরা পায়ের ভৃত্যে পরিণত করেছে। দলে দলে কারাগারে কারাগারে ওরা হাসিমুখে বছরের পর বছর অন্ধকারায় নির্যাতন ভোগ করছে, তবুও এমন কোন শক্তি নেই এদের কর্তব্যচ্যুত করতে পারে। হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতেও এতটুকুও দ্বিধা নেই, নেই এতটুকুও মৃত্যু-ভয়।

কেন? কিসের আশায়? কিসের মোহে ওরা জীবন সংশয় জেনেও পতঙ্গের মত উদ্ভ্রান্ত হয়ে আগুনের দিকে ছুটে যায়? রমেন আর মণিমালার মত হাজার হাজার যুবক-যুবতী আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে এই যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে এ মোটেই আকস্মিকতার ফল নয়। বন্যার জলের মত জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয় নি। দেশকে ভালবাসার এ-ভাব বাইরের নয়, অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও নয়। অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত এর শিকড় বিস্তৃত।

জলধি আর এককড়ি? এরা ত সমুদ্র-জলের বুদবুদমাত্র, এই আছে, এই নেই। বিপ্লব করতে গেলেও কঠিন-কঠোর সাধনার প্রয়োজন। আর এর জন্য চাই মনের ঐকান্তিক আগ্রহ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়। পরহিতার্থে দুঃখ বরণ সবার দ্বারা সম্ভব নয়। এ-ত ধনকুবের এককড়ি'র মত সস্তায় বাজী মাৎ করতে গিয়ে স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে অবসর বিনোদনের উপায় নয়। প্রয়োজনে সাত-সমুদ্র তের নদী পাড়ে গিয়ে ফ্রীডম লীগ গড়ে তোলার কষ্ট স্বীকার করতেও দ্বিধা করে না। রমেন পেরেছে। অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে বিনা ভাড়ার, সরকারের বিনা অনুমতিতে জাহাজের ডেকে, খালাসির কাজের কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে ওকে। কিসের আশায়, কোন আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রত্যাশায় এ-কষ্ট স্বীকার?

শুধুমাত্র ফ্রীডম লীগ গড়েই রমেন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পেরেছে? তাই যদি হ'ত তবে ত পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করে অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য প্রয়াসী হতে দেখা যেত না। অনন্য সাধারণ দেশপ্রেম, প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি, প্রয়োজনে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার কৌশল প্রভৃতি বিপ্লব সাধনার মূলধন। এদের পার্সোন্যাল লাইফ আছে ঠিকই কিন্তু সবটাই ছকবাঁধা। এর এতটুকুও হেরফের হবার উপায় নেই।

এককড়ি, রমেন বা স্বদেশ— কল্যাণ সঙ্ঘের সদস্যরা রমেন ও মণি'র মত বিপ্লবীদের মনের খবর পাবে কি করে? ধনকুবের এককড়ি সস্তায় নাম কেনার জন্য কল্যাণ-সঙ্ঘ

খুলে মেকী দেশসেবায় মেতেছে। আত্মত্যাগ নয়, আত্মপ্রচারই ওর সমাজসেবামূলক কাজের একমাত্র লক্ষ্য। আর জলধি? সমাজসেবামূলক কাজটুকু এককড়ি বেতনের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে। যতদিন মাসিক বেতন যোগান দিতে পারবে ততদিন কল্যাণ সংঘ জলধির সেবা পাবে। বেতন বন্ধ হয়ে গেলে ওর সমাজসেবামূলক কাজেও ভাঁটা পড়বে নির্ঘাৎ। এর মধ্যে আন্তরিকতার স্থান কতটুকু আছে বুঝা মুশকিল। আর বাকী রইল অন্যান্য মেম্বররা। এদের সমাজ সেবা আরও হিসেব মেনে চলে। অধিবেশনের দিন এককড়ি পাই পয়সা পর্যন্ত ট্রেনভাড়া মিটিয়ে দেয় বলেই মাঝে মধ্যে অধিবেশনে যোগ দেবার অজুহাতে বৈকালিক ভ্রমণ সেরে যায় মাত্র। এর মধ্যে সমাজসেবামূলক মনোভাবের নাম গন্ধও যে নেই তা মেম্বাররা যেমন জানে, এককড়িরও অজানা নয়। আর এককড়ি শুধুমাত্র সাইন বোর্ড রক্ষার তাগিদে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া অর্থ দু'হাতে ছিঁটিয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কল্যাণ-সংঘের কল্যাণে কি পরিমান টাকা ও উড়িয়েছে, বিনিময়ে নাম যশ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার হিসেব কোনদিন ও করতে বসে নি। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে, এ-দুর্মতি আজ পর্যন্ত এককড়ির মাথায় ঢুকিয়ে দেন নি। আর হবে বা কি করে? জলধি যে প্রতিনিয়ত ওর কানের কাছে বীজমন্ত্র আওড়েছে, 'এককড়িদা কর্ম করে যাও', ফলের প্রত্যাশা এখন নয়। আখেরে ফল পাবে, মিলিয়ে নিয়ো।' এই ত হ'ল স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘের সদস্যদের সমাজ সেবার ধরণ ধারণ। এদের পক্ষে মনি'র খবর বা রমেনের বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে থাকার প্রকৃত হেতু হদিস পাওয়া ত সম্ভব নয়।

সন্ধ্যার কিছু পরে রমেন ফিরে এল। মণি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আগে জামা খুলে একটু বিশ্রাম করে নাও, পরে সব শুনব। রমেন জামা খুলতে খুলতে বললে, আমি ত ভেবেছিলুম, তোমায় বাসায় পাব না, অধিবেশনের কাজে হয়ত বেরিয়ে গেছ।

হাঁ, সেরকমই কথা ছিল বটে।

তবে?

সুকল্যাণদির চিঠি নিয়ে এনা ও হেনা এসেছিল। কিছু লেখালেখির কাজ ছিল, ঘরে বসেই সেরে নিয়েছি। এই ত মাত্র আধ ঘণ্টা আগে ওরা গেছে।

রমেন জামাটা আলনায় রেখে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে, ভালই হ'ল এবেলাটা একটু বিশ্রাম পেলে।

ভাল কথা, ঠিকানা অনুযায়ী জায়গাটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয় নি ত?

রমেন ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললে, কি যে বল মণি। যে-লোক সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় তার পক্ষে তোমার বজবজের একটা ঠিকানা বের করা কি একটা সমস্যা?

তারপর?

তারপর আর কি তোমার দেয়া ঠিকানা খুঁজে খুঁজে রাস্তার ধারের ঝুপড়িটার কাছে গেলুম। দেখি, দরজা বন্ধ। হতাশ হয়ে ফিরে এসে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলুম। কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার ঝুপড়িটার কাছে গিয়ে দেখি দরজা খোলাই রয়েছে।

লক্ষ্য করলুম, যাবতীয় ব্যবস্থাই সুপরিকল্পিত। আমি ঝুপড়িটার আশপাশ দিয়ে বার কয়েক চক্কর মারতেই ঝুপড়ির মালিক ভিখারী মত লোকটা সংকেত দিল। আমিও পাল্টা সংকেত দিলুম। আমি ওর চোখের ইশারায় কাছে গেলুম। আমায় ঝুপড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। তোমার দেয়া চিঠিটা ওর হাতে দিলুম। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললে। এবার যন্ত্র চালিতের মত মেঝেতে ছেঁড়া কাঁথা ও বস্তা সরিয়ে একটা গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলে। বেরিয়ে এল ছোট একটা প্যাকেট। ওটার ভেতর থেকে এ-চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিলে এই নাও—কথা বলতে বলতে রমেন একটা ভাঁজকরা কাগজ মণির দিকে বাড়িয়ে দিল।

মণি ব্যস্ত হাতে কাগজটার ভাঁজ খুলে ফেলল। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটার ছককটা পড়ে ফেলল। চাপা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললে, পিছনে টিকটিকি লেগেছে। এখানে আর বেশীদিন থাকা নিরাপদ নয় রমেন। যা হোক কিছু একটা ভাব। তাছাড়া চট্টগ্রাম থেকে ঘন ঘন খবর আসছে, অস্ত্র চাই—অনেক অস্ত্র।

হাঁ, টিকটিকির উৎপাত যে শুরু হয়েছে আমিও বুঝতে পারছি মণি। বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে এ পর্যন্ত ধাওয়া করাও ওদের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

ভগবানের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়, ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দেয়া সম্ভব। কিন্তু টিকটিকিগুলোর চোখ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন চারিদিকে যেমন কাজের তোড়জোড় চলছে, তোমায় বাইরে থাকতেই হবে রমেন। তুমি বরং ইউরোপে যাত্রা করার কথা ভাব।

অবশ্যই। ইওরোপে পাহাড় প্রমাণ কাজ জমিয়ে এসেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই ফেরা দরকার। এদিকে তোমার চাকরিটাও যতদূর মনে হ'ল আমার জন্যই খোয়াতে হয়েছে।

তুমি ত জানো, আমার চাকরিটা ছিল আসলে একটা ছল।

তবুও ত একটা অবলম্বন ছিল।

হাঁ, তা ছিল বটে। এককড়িদার কল্যাণ সংঘের ছত্রছায়ায় থেকে বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা নিরাপদ ছিল। আমায় কেউ সন্দেহ করত না। নির্বিঘ্নে ছক অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যেতুম। মণি, আমি নিঃসন্দেহ, তোমার ধ্যানজ্ঞান তপস্যার তিলমাত্রও ভুল নেই। পরবর্তী পর্যায়ের কাজকর্ম কিভাবে চালাবে ভেবেছ কিছু? এবার থেকে যদি সরকারের পোষ্যপুত্র টিকটিকিগুলো তোমার পিছনে লাগে আত্মরক্ষার কি ব্যবস্থা নেবে, ভেবেছ কিছু? সে-সম্ভাবনা ত পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে রমেন, তুমিও জান। আর আমারও অজানা নয়। ভাবিনি কিছুই। এখন আর পিছনের দিকে চোখ নেই। তাই বলে কর্তব্যচ্যুত হয়ে—

না, তা বলছি নে। ভয়ে মুষড়ে পড়ার মেয়ে তুমি নও, ভালই জানি। তোমায় ত আজ থেকে নয়, সেই স্কুল—জীবন থেকে দেখে আসছি। ভয় কাকে বলে তোমার

জানা নেই। ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

নইলে একাধিকবার জেল খেটেও বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়াতে পারি নি আজও। আজ ভয় আমার জন্য নয়—

নারী-কল্যাণ-সমিতির ব্যাপার স্যাপার কিছু আঁচ করতে পারলে? আজ বিকেলে এনা আর হেনা এসেছিল, তোমায় ত বলেছিই।

কিছু আভাষ পেলে?

সুকল্যাণী মিটার নাকি বলেছেন, আমায় হোল টাইম ওয়ার্কার করে নিতে খুবই আগ্রহী। পঁচাত্তর টাকা বেতনও দিতে চাচ্ছেন। শুনে তুমি কি বললে?

পাকাপাকি কিছু বলি নি। দু'দিন সময় চেয়ে নিলুম। তোমার ও জলধিদার মতামত নিয়ে জানিয়ে দেব ভেবেছিলাম।

আমি অমত করব ভেবেছ নাকি? আশা করি জলধিবাবুও এক কথাতেই সম্মতি দিয়ে দেবেন। অর্থাগমের চেয়েও এরকম একটা সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকলে আমাদের কাজের দিক থেকেও অনেক নিরাপদ। টিকটিকিগুলো অন্ততঃ তোমায় সন্দেহের চোখে দেখবে না। ভাল কথা, আমাদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের কথা জলধিবাবু কিছু জানেন কি?

জানেন। সবই খোলাখুলি ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমি এখন অন্ততঃ নিঃসন্দেহ, জলধিদা তোমার মতই আমার একজন সত্যিকারের হিতাকাঙ্খী। কিছুদিন আগ পর্যন্ত যা করেছেন স্বতন্ত্র কথা। এখন কিন্তু আমায় নিজের মায়ের পেটের বোনের চেয়েও বেশী ভালবাসেন।

হ্যাঁ, ওনার মত একজন সত্যিকারের হিতৈষী কাছাকাছি পাশাপাশি থাকলে সব দিক থেকেই বল ভরসা।

আমার জন্য কিছু ভেবো না রমেন। আমি নিজেও কোনদিন ভাবিনি, আজও ভাবিনে। এ মুহূর্তে আমার যত ভাবনা ত তোমাকে নিয়ে। তুমি ইওরোপে যাত্রা না করা পর্যন্ত আমার এতটুকুও স্বস্তি নেই। কি করবে, ভেবেছ কিছু?

ভাববার সময় আর পেলুম কোথায়, বল দেখি? ক'দিন ধরে ত আজ এখানে, কাল ওখানে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি।

হাজার খানেক টাকা যদি ব্যবস্থা করে দেই, সাগর পাড়ি দিয়ে ইওরোপে পেঁছুতে পারবে কি?

রমেন চোখ দু'টো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললে, হাজার খানেক? অতটাকা তুমি পাচ্ছ কোত্থেকে, জানতে পারি কি?

পাচ্ছি নে, মনে করতে পার পেয়ে গেছি।

কিন্তু কোত্থেকে, বলবে ত?

মণি মুচকি হেসে বললে, শুনলে তুমি ত আবার রসিকতা শুরু করে দেবে। বলছি শোন, একদিন একজড়িদার কাছে এক হাজার টাকা চেয়েছিলুম। আজ তুমি

বেরোবার একটু পরেই নিজে এসে দিয়ে গেছেন। অবশ্য আমার বুদ্ধি যদি নাও তবে এক হাজার টাকা পকেটে নিয়েই ইওরোপে পৌঁছে যেতে পারবে। তাছাড়া যতই পরিচিত হিতাকাঙ্খী থাক না কেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পৌঁছেই ত আর নগদ টাকার থলি নিয়ে কেউ তোমার জন্য জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

তোমার বাহাদুরি আছে মণি। এক কথায় এককড়িবাবু এক হাজার টাকা ট্যাঁক থেকে বের করে দিলেন!

এটুকু না থাকলে বিপ্লব সাধনার এমন শক্তিশালী একটা chain কি করে গড়ে তোলা সম্ভব হ'ল ভেবে দেখত রমেন। শুধু কি তাই? এর পরিধি আজ আর ভারতবর্ষের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান ও জার্মানী যেখানে সেখানে সম্ভব বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ভারতমাতার কৃতি সন্তানরা গোপনে হাত ধরাধরি করে জ্যামিতিক ছক অনুযায়ী কাজ করে চলেছে। অথচ—

অথচ বাইরের চাল চলন চলাফেরা এমনি যে, যেন কোথাও কিছু হয় নি। যেন সহজ-সরল-স্বাভাবিক জীবনধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু অন্তর্বাহিনী নদীর মত, চোরা ঘূর্ণি স্রোতের মত আমরা যে গোপন আবর্তের মাধ্যমে সারা দেশকে তোলপাড় করে চলেছি ক'জন তার খোঁজ রাখে।

তুমি দেখে নিয়ো রমেন আমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবার নয়। যারা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে বুকের তাজা রক্ত দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করছে, ওদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ যে বৃথা যাবার নয় রমেন। আজ না হোক কাল পরাস্বাপহারী নির্লজ বেনিয়ার জাতকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সাগরপাড়ে পাড়ি দিতেই হবে। এ মুহূর্তে তোমার প্রধান কর্তব্য—

দেশ ছেড়ে সাগরপাড়ে —

হাঁ। হাঁ, রমেন। তোমার পিছনে স্পাই ঘুরঘুর করছে। কিছু একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলে পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে। চিটাগাঙে বিপ্লবীরা যে সুমহান যজ্ঞের আয়োজন করেছে তার প্রধান হোতা তুমি। হ্যাঁ, রমেন, তোমারই মুখ চেয়ে উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে ওরা। আর সেই তুমিই যদি হাতকড়া পরে জেলে গিয়ে ঢোক তবে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভাবতে পারছ!

অস্থিরমতি রমেন উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

তোমার এত মুষড়ে পড়ার কি আছে, বুঝছি না রমেন! টাকার ব্যবস্থা ত এককড়িদাই করে দিয়েছেন। উনি অবশ্য বিপ্লবের কাজে লাগাবার জন্য টাকাগুলো দেন নি, আমায় দিয়েছেন। একটু-আধটু অভিনয় করতে হয়েছে, এই যা। বিপ্লবীদের ত প্রথম পাঠই হচ্ছে অভিনয় শিক্ষা। মুচকি হেসে এবার ও বল্লে, আমি তবে পাকা অভিনেতৃ হতে পেরেছি, কি বল রমেন?

এদিক থেকে বিচার করলে তুমি আমার গুরু হওয়ার দাবী করতে পার মণি। এবার হেসে বল্লে, তুমি ত আমার গুরুই বটে। রাজনীতির প্রথম পাঠ, আমার মধ্যে

বিপ্লব-চেতনার উন্মেষ ত তুমিই ঘটিয়েছ মণি, অস্বীকার করতে পারব না। কথা বলতে বলতে রমেন মণি'কে ধরার জন্য হাত বাড়াল।

মণি দরজার দিকে চোখ রেখে বলে উঠল, এই যে জলধিদা, আসুন।

রমেন সচকিত হয়ে হাতটা টেনে নিল। অপ্রতিভ হয়ে দরজার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে জলধিদার চিহ্নমাত্রও নেই।

মণি খিল খিল করে হেসে উঠে বল্‌লে, এই যে মশাই, মাথার ওপরে খড়্গ ঝুলছে। এখন সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা ভাব।

টাকা যখন যোগার রয়েছে, আর ত ভাবনার কিছু নেই। জাহাজে উঠব। সোজা জার্মানিতে গিয়ে নামব।

শোন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার সময় পাই নি। আমি ইতিমধ্যেই তোমার ইউরোপে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছি। ঐ যে সেদিন ডায়মণ্ড হারবারে বড় রাস্তার বাঁকের কাছে একটা ঝুপড়িতে তোমায় নিয়ে গিয়েছিলুম, মনে আছে নিশ্চয় ?

সেই কুষ্ঠরোগীটার কথা বলছ ?

হাঁ। তবে ওর কুষ্ঠ হয় নি মোটেই। কুষ্ঠরোগী সাজানো হয়েছে। তুমি আগামীকাল সন্ধ্যার পর আমার চিঠি নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে। খুব সাবধান চারদিকে চোখ কান খাড়া রাখবে কিন্তু। যাক, যে-কথা বলছিলুম, ওর ঝুপড়ির ভেতরে, ছেঁড়া মাদুর কাঁথার তলায় একটা ডবল চেম্বারের পিস্তল ও কিছু গুলি রাখা আছে। ওগুলো সঙ্গে রাখবে। আর তোমার কাছে যে সাধারণ পিস্তলটা আছে ওটা ওকে দিয়ে দেবে। তারপর ও তোমায় গঙ্গার ধারের এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবে। কয়েকজন আগে থাকতে ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। দ্বিধার কারন নেই, সবাই তোমার পরিচিত না হলেও মুখচেনা। পোষাক বদলে নেবে। ওরাই জাহাজে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। মালবাহী জাহাজ। জাহাজের খালাসীদের মধ্যেও দু'-চারজন আমাদের লোক পেয়ে যাবে। জানতে পারবে পরিচিত ইশারার মাধ্যমে। ভাড়ার টাকাটা পকেটে নিয়ে গন্তব্যস্থলে নামবে। এক হাজার টাকা পকেটে থাকলে বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে প্রথম ধাক্কাটা ত অন্ততঃ সামলে নিতে পারবে।

রমেন হেসে বললে, মণি, সত্যি তুমি আমার গুরু! না, গুরু নয়, বলতে পার গুরুর গুরু। বয়সে ছোট না হলে তোমার পায়ের ধুলো পাথেয় করে নির্ভয়ে সমুদ্র পাড়ে রওনা হতুম। তোমার মত যদি আরও কয়েকজনকে—

মনি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে, থাক মশাই, আর কাব্যি করে কাজ নেই। অনেক রাত হয়েচে। খাবার তৈরী। ভোর পাঁচটায় আবার এনা আর হেনা আসবে। আমায় বেরোতে হবে। চল, খাবে চল।

নবম পরিচ্ছেদ

রমেন অতন্দ্রপ্রহরী টিকটিকির চোখে ধুলো দিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড় ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। জাহাজের খালাসী সেজে দিব্যি অন্যান্যদের সঙ্গে মিশে গেছে।

মণি বাস্তবিকই রমেন-এর জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল। ধরা পড়ে জেল খাটার ভয় নয়। ও-ই বৈদেশিক সাহায্যের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। ওর অক্লান্ত প্রয়াস ও নিরলস সাধ্য সাধনার ফলেই সাগরপাড়ে, সুদূর ইউরোপে ফ্রীডম লীগ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আর ওরই নেতৃত্বে লীগের বিপ্লবী সদস্যরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঘোরাফেরা করে পরিকল্পনা মাফিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জাহাজ বোঝাই করে এদেশে চালান দিচ্ছে। এমন একজন অত্যাবশ্যকীয় সক্রিয় কর্মী যদি হাতকড়া পরে অন্ধকার কারাগৃহে আশ্রয় নেয় তবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ স্তিমিত হতে বাধ্য।

রমেন নির্বিঘ্নে জাহাজে উঠতে পেরেছে জানতে পেরে মণির উৎকণ্ঠা দূর হ'ল। এবার কিছুদিনের জন্য বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড স্থগিত রেখে ও এবার নারী-কল্যাণ-সমিতির কাজে পুরোপুরি মেতে গেল।

সুকল্যাণী মিটার একজন পাকা জহুরী। মানুষ চেনার অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন ভদ্রমহিলা। যদিও মণির সম্বন্ধে এর-ওর মুখে অনেক আগেই কিছু কিছু শুনেছিলেন। এখন নারী-কল্যাণ-সমিতির সুবাদে ওর সান্নিধ্যে আসতে পারায়, এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে পূর্বার্জিত ধারণার ভিত অধিকতর সুদৃঢ় হ'ল। একটা মেয়ের মধ্যে এতগুলো পরস্পর বিরোধীগুণের যে একত্র সমাবেশ ঘটতে পারে তা বাস্তবিকই ওঁর ধ্যান ধারণা বহির্ভূত ছিল। এতদিন সুকল্যাণী মিটার জানতেন, মণি বুদ্ধিমতী। অনন্য সাধারণ ওর উপস্থিত বুদ্ধি বা যেকোন জ্ঞানী-গুণি লোককে চমকে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। হাতের লেখা চকচকে ঝকঝকে, যা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অসীম ধৈর্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও নিরলসভাবে চেয়ার অবলম্বন করে কাটিয়ে দিতে পারে, যা যেকোন পুরুষের পক্ষে কল্পনাও করা যায় না।

গত সন্ধ্যায় সুকল্যাণী মিটার মণি'র একটি বিশেষ বিদ্যা হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলেন, যা সে অঞ্চলের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। নারী-কল্যাণ-সমিতির আসন্ন অধিবেশন সংক্রান্ত জরুরী এক সভার কাজ চলছিল। এনা, হেনা ও মণি থেকে শুরু করে সমিতির বহু সদস্যা উপস্থিত হয়েছেন। সুকল্যাণী মিটারের বৈঠকখানায় সভার কাজ চলছিল। সদস্যাদের উপস্থিতিতে বিশালায়তন ঘরটায় তিলধারণের জায়গা নেই। অন্যান্যদের মধ্যে মণিই নবাগতা। মাত্র ক'দিন হ'ল ও এ-সংস্থায় যোগ দিয়েছে। সুকল্যাণী মিটার সভার মধ্য মণি হয়ে আসর আলোকিত করে বসে আছে। সভার কাজ তখনও শুরু হয় নি। মণি'র সঙ্গে যাদের তখনও পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, সভার কাজ শুরু করার আগে সুকল্যাণী মিটার নবাগতা মণি'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

এমন সময় ভেতর বাড়ি থেকে এক পরিচারিকা এসে সুকল্যাণী মিটারকে ইশারা করে

ডেকে নিয়ে গেল।

মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই সুকল্যাণী মিটার সভা-কক্ষে ফিরে এলেন। ওর চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। তিনি উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে কর জোড়ে নিবেদন করলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমায় কিছু সময়ের জন্য ছুটি দিতে হবে। আকস্মিক উদ্ভূত এক বিপদের জন্যই আমি আপনাদের সঙ্গদান করতে পারছি নে। অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির জন্য আশা করি আপনারা আমায় ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের সংস্থার সদস্যা কুমারী এনা মুখার্জী আজকের সভার আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছে। আর আপনাদের নিষ্ঠা ও আগ্রহ সম্বন্ধেও আমি যথেষ্ট আস্থা রাখি। আপনারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে। কথা ক'টা কোনরকমে ছুঁড়ে দিয়ে সুকল্যাণী মিটার ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটে গেলেন।

এনা মুখার্জীর নেতৃত্বে নারী-কল্যাণ-সমিতির সভার কাজ শুরু হ'ল।

উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য লক্ষিত হ'ল। সবার চোখেই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার ছাপ। একই প্রশ্ন, হঠাৎ এমন কি আকস্মিক ঘটনা ঘটতে পারে যার ফলে সুকল্যাণী মিটারের মত এমন নিষ্ঠাবতী মহিলা সভাকক্ষ ছেড়ে যেতে পারেন? সবার কাছেই ব্যাপারটা কৌতূহলের উদ্রেক করল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ও'র একমাত্র পুত্রবধূর প্রসব-বেদনা উঠেছে।

গ্রামেরই এক বৃদ্ধা ও অভিজ্ঞ ধাত্রীকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। বৃদ্ধা ওর বিদ্যাও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রসূতির প্রসব-কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু হায়! প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। আর এদিকে সুকল্যাণী মিটার বিষন্ন মুখে দরজার সামনে অসহায় ভাবে পায়-চারি করছেন। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় ওর মুখ রক্ত শূণ্য—চকের মত ফ্যাকাসে। নিরুপায় দেখে গাড়ী দিয়ে শহরের হাসপাতালে লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে আসার সম্ভাবনা নেই। আবার প্রসূতির অবস্থাও এমন সংকটজনক যে, গাড়ী ক'রে হাসপাতালে পাঠাতেও ভরসা পেলেন না। যেকোন সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

বৃদ্ধা ধাত্রী ওর অধীত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শেষ চেষ্টা করে আতুর-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে সদস্যারা সভার কাজ মিটিয়ে সুকল্যাণী মিটারের কাছে এলেন। মণিও ওদের সঙ্গে রয়েছে। যন্ত্রণাকাতর প্রসূতি ঘরের মধ্যে রীতিমত দাপাদাপি করছে। উপস্থিত মহিলারা পড়ল মহাফাঁপড়ে। এ-যন্ত্রণা চোখে দেখাও যায় না, আবার করারও কিছু নেই। মানুষের বিপদের মুহূর্তে কিছু করা না যাক, চেষ্টালিপ্ত হতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যায়।

ভিড়ের মধ্য থেকে মণি'র কণ্ঠ শোনা গেল, সুকল্যাণীদি যদি আপত্তি না থাকে আমি একবারটি চেষ্টা করে দেখতে চাই।

সুকল্যাণী মিটার ওর কথাটা কানেই নিলেন না। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসির

ছোপ ফুটিয়ে তুলে আবার ঘাড় ঘুরিয়ে আতুর ঘরের দরজার দিকে তাকালেন।

মণি এবার বললে, সুকল্যাণীদি, দয়া করে অনুমতি দিলে আমি একবারটি চেষ্টা করে দেখি।

সুকল্যাণী মিটারের মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। তিনি মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে দেখ তবে চেষ্টা করে।

পাশেই দেয়ালে হেলান দেয়া একটা সাইকেল ছিল। মণি ব্যস্ততার সঙ্গে সাইকেলটা টেনে আনতে আনতে বললে, সাইকেলটা কার? নিয়ে যাচ্ছি, মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

কেবলমাত্র অন্যান্য সদস্যারাই নয়, মণিকে দ্রুত গতিতে সাইকেল চালিয়ে চলে যেতে দেখে ওর বান্ধবী এনা আর হেনাও কম স্তম্ভিত হ'ল না। মণি যে পুরুষের মতই সাইকেল চালাতে দক্ষ স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে নি।

কী আশ্চর্য ব্যাপাররে বাবা! প্রসূতি আতুরঘরে পড়ে কাৎড়াচেছ, আর মণি চেষ্টা করে দেখবে বলে সাইকেল চেপে কোথায় উধাও হয়ে গেল?

মণি মিনিট দশেকের সময় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এল ঠিক আট মিনিটের মাথায়। সদর দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ভেতর-বাড়িতে ঢুকে সাইকেলটাকে সশব্দে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে হাতে গ্লাবস্ পড়তে পড়তে ব্যস্ত-পায়ে আতুরঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সুকল্যাণী মিটার ছুটে ওর কাছে এলেন। কিছু বলার চেষ্টা করলেন। মণি ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সোজা আতুরঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সুকল্যাণী মিটার মণি'র ওপর পুত্রবধূর প্রসবের দায়িত্ব দিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। নিজের কাজের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হতে লাগলেন। ভাবলেন, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ধাত্রী যেখানে অক্ষমতা জানিয়েছে সেখানে অমন অনভিজ্ঞা একটি মেয়ের কথায় সম্মতি দেয়া মোটেই উচিত হয় নি। কি করতে, কি করে বসবে; শেষ পর্যন্ত গাছ ও ফল দু'-ই হারাতে না হয়। তাছাড়া শহরে গাড়ী পাঠানো হয়েছে। ডাক্তার নিয়ে ফিরতে দেরী হবে ঠিকই। ইতিমধ্যে রোগী কষ্টও পাবে যথেষ্ট। কিন্তু আনাড়ির হাতে মরার চেয়ে অচিকিৎসায় মরা অনেক ভাল। অন্ততঃ নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধে মরতে হবে না।

ত্রৈলোক্যভর্তি লোক। নারী-কল্যাণ-সমিতির সদস্যারা কেউ বাড়ি যান নি। সবার মুখেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ সুস্পষ্ট। একে অন্যের মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

অস্থিরচিত্ত সুকল্যাণী মিটার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। ও'র সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। তিনি পাশের বারান্দায় কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। হেনা দৌড়ে ঘর থেকে একটা পাখা এনে ওকে হাওয়া করতে লাগল।

এক মিনিট দু'মিনিট করে ক্রমে কুড়ি মিনিট গড়িয়ে গেল। আতুরঘরে ও বাইরে—সর্বত্র অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন কেউ ভরসা পাচ্ছে না।

ক্রমে আরও পাঁচ মিনিট গড়িয়ে গেল। এমন সময় আতুর ঘরের ভিতর থেকে সদ্যোজাত শিশুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সুকল্যাণী মিটার উন্মাদিনীর মত এক লাফে আতুরঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এমন সময় দরজাটা সামান্য ফাঁক হ'ল। দরজার পাল্লা দুটোর ফাঁক দিয়ে মণি'র হাসিমাখা মুখ উঁকি দিল। ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু অক্ষুন্ন রেখেই মণি বললে—সুকল্যাণীদি, মিষ্টি ছাড়া নাতির মুখ দেখতে দেয়া হবে না। তাড়াতাড়ি মিষ্টির ব্যবস্থা করুন।

সুকল্যাণী মিটারের উৎকণ্ঠা দূর হ'ল না। মুখের উৎকণ্ঠার ছাপটুকু অক্ষুন্ন রেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন, বৌমা? বৌমা সুস্থ?

হাঁ, শিশু ও ওর মা উভয়েই সুস্থ। দয়া করে আরও কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরুন। কিছু কাজ এখনও—কথা শেষ করার আগেই মণি আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

সদর রাস্তায় মোটরের হর্ণ শোনা গেল। মিঃ মিটার এক প্রবীণ ডাক্তারকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ভেতর-বাড়িতে ঢুকলেন। সুকল্যাণী মিটার হাসিমুখে স্বামীর কাছে ছুটে এসে বললেন, ডাক্তারবাবুকে কষ্ট দিয়ে এতটা পথ টেনে এনেছ, পেট ভরে মিষ্টি না খাইয়ে কিন্তু ছাড়বে না।

মিঃ মিটার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপা এঁকে বললেন মিষ্টি!

হাঁ গো, মিষ্টি। সে কী তোমার প্রথম নাতি হয়েছে, মিষ্টিমুখ না করিয়েই বিদায় দেবে!

এমন সময় মণি সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে আতুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার ওর ওষুধ ও সরঞ্জামের বাক্সহাতে আতুরঘরে ঢুকে গেলেন। প্রসূতির নাড়ী, চোখ ও প্রেসার প্রভৃতি বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন। মণি'কে কয়েক হাত দূরে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ হেসে হেসে কি সব জিজ্ঞেস করলেন। সবশেষে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মিঃ মিটার ও মিসেস মিটার মণিকে রাত্রিটুকু প্রসূতি ও শিশুর কাছে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। মণি কিছুতেই রাজী হ'ল না। মণি বার বার বলল, শিশু ও ওর মা উভয়েই সুস্থ। আপনাদের উৎকণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই। তাছাড়া তেমন প্রয়োজন বুঝলে মোটর পাঠিয়ে দেবেন, দশ মিনিটের মধ্যেই আমি পৌঁছে যাব।

সুকল্যাণী মিটার নিজে মোটর চালিয়ে মণিকে পৌঁছে দিতে চললেন। পথে যেতে যেতে তিনি মুচকি হেসে বললেন, তুমি নার্সিং জান, আগে ত কোনদিন বল নি মণি।

আগে ত কোনদিন প্রয়োজন হয় নি যে, বলব। তাছাড়া জানিই বা এমন কি যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে লোকের কাছে বলে বেড়াবো?

কোথাও ট্রেনিং নিয়েছিলে, নাকি—

ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মণি বললে, তেমন কিছু নয়, একটু-আধটু শিখেছি, ব্যস।

কেন মিছে গোপন করার চেষ্টা করছ মণি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তোমার খুব প্রশংসা করে গেলেন। প্রসূতির অবস্থা নাকি খুবই—

হাঁ, খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন, মিথ্যে নয়। এ-ও ঠিক, আর আধ ঘণ্টা খানেক দেরী হলে প্রসূতি ও শিশু কাউকেই হয়ত বাঁচানো সম্ভব হ'ত না।

মণি, সত্যি করে বল ত, এ-বিদ্যা কোথায় শিখেছিলে ?

ঢাকায় থাকাকালীন পড়াশুনার ফাঁকে নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছিলুম। সার্টিফিকেটও একটা রয়েছে। বাক্সে পড়ে। পোকায় কাটছে। এতদিন পর অধীত বিদ্যেটাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেলুম।

মণি'র বাড়ির সামনে মোটর দাঁড়াল। মণি মোটর থেকে নেমে মুচকি হেসে বললে, এত রাত্রে আপনাকে বসতে বলে মৌখিক ভদ্রতা দেখাবার উৎসাহ নেই সুকল্যাণীদি। গুডনাইট। গুডনাইট।

কাল দেখা হবে কেমন ?

আচ্ছা। কথা বলতে বলতে মোটর ঘুরাতে গিয়ে সুকল্যাণী মিটার থমকে গিয়ে বললেন, ভাল কথা, মণি, সকালে মোটর পাঠিয়ে দেব, চলে যেয়ো। আর সমিতির কাজ সেরে তোমার কিন্তু আর বাড়ি আসা হবে না। দুপুরের খাওয়ার ব্যাপারটা আমার সঙ্গেই সারবে, রাজী ত ?'

মণি মুচকি হেসে বললে, আজ আপনার কথা রাখতে পারি নি বলে অপরাধের অন্ত নেই। কাল না খেয়ে ফিরে আসতে চাইলে হয়ত কয়েক ঘা বসিয়েই দেবেন। এ-বয়সে মার খাওয়ার চেয়ে—

সুকল্যাণী মিটার হেসে বললেন, তবে রাজী, কি বল ? মণি হেসে বললে, আপনি মোটর পাঠিয়ে দেবেন। যা হোক পেটে বা পিঠে কিছু একটা না খেয়ে ফিরছি না।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মোটর এগিয়ে চলল !

দশম পরিচ্ছেদ

এককড়ি বিকেলে স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের অফিস-ঘরে একা বসে কয়েকটা পুরণো কাগজপত্রের ওপর অলসভাবে চোখ বুলোচ্ছে। মুখে গুড়গুড়ির নল। দাঁত দিয়ে চেপে রাখা। এমন সময় দরজায় জলধি'র মুখ ভেসে উঠল।

এককড়ি মুখ থেকে নলটা নামিয়ে বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললে, কি হে দুর্যোধন, দু'-তিনদিন কোথায় ডুব দিয়ে ছিলে ? একেবারে বে-পাত্তা হয়ে গিয়েছিলে যে !

জলধি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললে, কোথায় আর যাব দাদা, মেসেই শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলুম। শরীরটা ক'দিন ভাল যাচ্ছে না,—

মিথ্যে কথা বোলো না জলধি, জিভ খসে পড়বে বলে দিচ্ছি!

বাঃ রে। মিথ্যে বললুম কোথায়!

মিথ্যে বল নি? একটা মিথ্যে ঢাকতে এবার হাজারটা মিথ্যে কথা বলতেও তোমার মুখে বাঁধবে না, আমার ভালই জানা আছে। শরীর খারাপ না হাতী, তারচেয়ে বল, মণি'র ল্যাং খেয়ে কুপোকাৎ হয়ে বিছানা আঁকড়ে পড়েছিলে। পরে ভাই, আমাদেরও ত একদিন এ-বয়েস ছিল। আজ না হয় চুলে পাক ধরেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। তাই বলে অভিজ্ঞতাটুকুও কি মরচে পড়েছে।

জলধি চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসে বললে, এককড়িদা মণি'র কথা ছেড়ে দিন।

এককড়ি ঠোঁট দিয়ে নলটা শক্ত করে চেপে ধরে মুচকি হেসে বললে, সে কী জলধি এ যে ভূতের মুখে রমে নাম শুনছি হে! যে মণি'র কথায় তোমার কলজেটা লাফিয়ে উঠত, আজ সেই তুমি ওর প্রসঙ্গ চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছ যে। মনি আর রমেন ছোঁড়াটা বুঝি মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল, তাই না?

না! এসব কিছু নয়। আসলে মণি'র সঙ্গে আমার একটা understanding হয়ে গেছে। ওর সম্বন্ধে আর অন্য রকম কিছু ভাবার অবকাশ নেই দাদা।

Understanding? মানে মণি'র সঙ্গে একটা নতুন বোঝাপড়া কিছু হয়েছে?

কি করব বলুন ত এককড়িদা? মনিটা হঠাৎ জলধিবাবু থেকে একেবারে জলধিদা বলে এমন করে হাত দুটো চেপে ধরলে সে, আমি আর টু-শব্দটিও করতে পারলুম না। ব্যস, প্রেমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে গেল!

এককড়ি কল্কের আগুন উস্কে দিতে দিতে বললে, তাই নাকি! তবে জোর ফাঁসিয়েছে বলতে হবে জলধি!

ওসব কথা থাক এককড়িদা।

জলধি মেয়েটা সত্যি ভাল। দোষের মধ্যে একটাই, সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত। তবে তুমি বা আমি, কেউ কিন্তু একে দোষ বলে মনে করতে পারিনে, উচিতও নয়। দেশের কাজ করতে গিয়ে জেলের ঘানি আমাদেরও দু-একবার যে টানিনি তা-ত নয়। আজ না হয় গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে জপের মালা নিয়ে বসেছি, কি বল?

সে-ত নিশ্চয়ই এককড়িদা!

বলতে পার, তবে ওর কল্যাণ সঙ্ঘের চাকরিটা কেন খেলুম, এই ত?

এটা কিন্তু আমাদের মস্ত একটা ভুলই হয়ে গেছে। ম্লান হেসে এককড়ি বললে, ভুল? আমার ত মনে হয় আরও কিছুদিন আগে এটা হলে ভাল হত। বলতে পার জলধি এতে মণি'র পক্ষে বরং শাপে বরই হয়েছে!

জলধি বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, চাকরিটা গিয়ে মণি'র পক্ষে ভাল হয়েছে। শাপে বর হয়েছে বলছেন।

অবশ্যই ?

যেমন !

মণি'কে এতদিনে কতটুকু চিনেছ জলধি ? লালসা—মাখানো দৃষ্টিতে অষ্টক্ষণ ও ওর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকতে। ওর ভেতরটাকে যাচাই করার অবকাশ কোথায় ছিল তোমার ! আমি ওর মধ্যে নারীসত্তার জাগ্রত প্রতিভার আভাষ পেয়েছিলাম। সুকল্যাণ মিটারের নারী কল্যাণ সমিতিই ওর উপযুক্ত স্থান। কিছু করার, নিজেকে প্রকাশ করার অন্ততঃ সুযোগ পাবে মনি। আর আমাদের স্বদেশ কল্যাণ-সংঘ ? অস্বীকার করার উপায় নেই, এটা অবসর বিনোদনের একটা আখড়ামাত্র। যদিও অনেক বড়-বড় কথা লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের কাছে আমাদের ভুয়ো-কর্মসূচী প্রচার করে বাহাবা নেয়ার— চেষ্টাই আমাদের অন্যতম কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এতেই আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি অস্বীকার করতে পার জলধি ?

জলধি নির্বাক রইল !

কিগো স্বদেশ কল্যাণ-সংঘের মহাসচিব, চুপ করে রইলে কেন, কিছু ত বল ? অবশ্য তোমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু সাফাই গাইতে চাইছি না জলধি। নিজের অক্ষমতাও স্বীকার করছি।

জলধি বললে, এককড়ি দা, আমি আগেও কোনদিন আত্মার আলোচনা করব না। কল্যাণ-সংঘের আপনিই দেহ, আপনিই প্রাণ। আর আমরা শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

ম্লান হেসে এককড়ি বললে, আমি ত আগেই আমরা অযোগ্যতাই বল, আর অক্ষমতাই বল স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছি। আমি তোমার দোষারোপ করছি মনে করে থাকলেও কিন্তু আমার প্রতি অবিচারই করা হবে জলধি।

আমি ত সেই কবেই পরের হাতে ঠেলে ফেলার আগেই স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘের গঙ্গা যাত্রা সমাধা করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলুম। আপনিই ত বাধ সেধেছিলেন সেদিন।

শেষ নিঃশ্বাসটুকু বেরোবার পূর্বে সমারোহ করে কল্যাণ-সংঘের সাইনবোর্ডটাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলে, তাই না ?

হাঁ ঠিক তা-ই। এই যে আলমারি বোঝাই খাতাপত্রে অব্যবহারে ধুলো জমছে, এরা সংখ্যায় ও ওজনে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু কি-ই বা দাম ? একটা কানাকড়িও নয়। সেদিন আমি সৎ-পরামর্শ'ই দিয়েছিলুম, দেশলাই জেলে সৎকার-পর্বটা সুসম্পন্ন করে ফেলতে।

তোমার ক'দিন ধরে হ'ল কি জলধি, বলত ? মনি নেই বলে সংস্থা উঠিয়ে দিতে হবে ? আমি যদি বলি, মণির স্বার্থে'ই কল্যাণ-সংঘকে টিকিয়ে রাখতে হবে ? নাভিশ্বাস যদি সত্যই উঠে থাকে তবে প্রয়োজনে অক্সিজেন দিয়ে একে টিকিয়ে রাখতে হবে জলধি

জলধি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

এককড়ি বললে, কি হে, কিছু বুঝতে পার নি ?

জলধি মাথা ঝাঁকাল।

এককড়ি বললে, আমাদের স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘ মণি-র নারী কল্যাণ-সমিতির সঙ্গে কোনদিনই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবে না।

তবে ?

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত না হয়ে আমাদের সংস্থা বরং নারী-কল্যাণ-সমিতির পরিপূরক সংস্থারূপে কাজ করুক এটাই আমার ঐকান্তিক আগ্রহ জলধি।

জলধি উচ্ছ্বসিত আবেগে লাফিয়ে উঠল, চমৎকার বলেছেন এককড়িদা! আমরা নারী-কল্যাণ-সমিতির পাশে গিয়ে দাঁড়াব। হাতে হাত ধরে অগ্রগতির দিকে সমানভাবে পা—পায়ে পা মিলিয়ে চলব আমরা আগামী কালের দিকে। আগামীকালের নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাব নারী-পুরুষ সবাই হাত ধরাধরি করে। অতীতের গ্লানিভরা দিনগুলোকে পিছনে ফেলে বীরদর্পে এগিয়ে যাব সম্মুখপানে। আগামীকালের অত্যুজ্জ্বল রক্তিম সূর্য হোক আমাদের ধ্যান জ্ঞান সাধনা।

জলধি অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে এককড়ির কথা শুনতে লাগল। জলধি, কাল কখনই থেমে থাকে না। প্রবাহমান কাল। আজকের জরাজীর্ণ দিনটা এক সময় ফুরিয়ে যাবে। নেমে আসবে রাত্রির অন্ধকার। সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুক চিঁড়ে পূর্ব আকাশে ফুটে ওঠবে রক্তিম ছোপ। উঁকি দেবে নতুন দিনের সূর্য। আসবে সকাল। আমরা নারী-পুরুষের সমবেত প্রয়াসে অন্ধকারের বুক থেকে ফুটন্ত সকাল, আগামী-কালের অত্যুজ্জ্বল সকালকে ছিড়ে আনব। তাই বলি কি জলধি, মণি যে সুমহান যজ্ঞের আয়োজন করেছে তা থেকে যদি আমরা দূরে সরে থাকি যদি আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হই তবে আগামীকাল আমরা আমাদের উত্তর সূরীদের কাছে কি জবাবদীহি করব, বলতে পার?

এককড়িদা, আপনার কথাই ঠিক। সুন্দর আগামীকালের সাধনায় আমরা মন-প্রাণ সঁপে দেব। যা কিছু পুরাতন তাকে শাশ্বত বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা থেকে বিরত থেকে আগামীকালের নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাব আমরা। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসুক, আঘাতের পর আঘাত আসুক ভারতবর্ষকে পুরনো আবর্জনামুক্ত করে শুচি শুভ্র করে তুলক আগামীকালকে। আদিম হিংস্র মানবিকতাকে চির নির্বাসন দেবার ব্রতই হোক আমাদের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা।

এমন সময় বাইরে সাইকেলের আওয়াজ শুনে এককড়ি ও জলধি সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকাল।

মণি-পাশের গ্রামে একটা ডেলিভারী কেসে গিয়েছিল। এপথেই ফিরছিল। এককড়ির সঙ্গে দেখা করতে এল। মণি বারান্দায় সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকল। ওর মাথার খাকি রঙের শোলার সাহেবী টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে মুচকি হেসে বললে, চলেই এলুম এককড়ি দা।

এককড়ি মুচকি হেসে বললে, তোমায় যে কল্যাণ-সংঘ থেকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি মণি!

মণি অনুরূপ হেসে বললে, তাড়িয়ে দিলেও যে আবার ফিরে ফিরে আসে সে-ই ত

আপনজন এককড়িদা।

এককড়ি ও জলধি সশব্দে হেসে উঠল। মণিও ওদের হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামিয়ে জলধি বললে, তোমার একী রূপ দেখছি অপরূপা! মাথায় টুপি, তা-ও আবার এলে সাইকেলে চেপে! তোমায় যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি মণি!

মণি হেসে বললে, সাইকেলটা সুকল্যাণীদি সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে দিয়েছেন। কোলের ওপর রাখা সাহেবী টুপিটা দেখিয়ে বললে, আর এটা আমি নিজেই কিনে নিয়েছি।

এককড়ি বললে, সাইকেল চাপার বিদ্যেটাও যে তোমার রপ্ত করা আছে, জানা ছিল না মণি।

গ্রামের লোকে কে, কি ভাববে তাই এতদিন বিদ্যেটা গোপনেই রেখেছিলুম এককড়িদা। দু'তিনদিন আগে এক আকস্মিক বিপদের মুখে ছেলেবেলায় শেখা বিদ্যেটা প্রয়োগ না করে উপায় ছিল না। ধরাই যখন পড়ে গিয়েছি—কথাটা শেষ না করেই মণি সরবে হেসে উঠল।

এককড়ি বললে, তারপর বল মণি, হঠাৎ কি মনে করে? মণি বললে, একটা আব্দার নিয়ে এসেছি এককড়িদা। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি। সুকল্যাণীদি আজ-কালের মধ্যে সংস্থার প্যাডে চিঠি লিখে হয় নিজেই আসবেন, নতুবা প্রতিনিধি কাউকে পাঠিয়ে ফর্মালিটি রক্ষা করবেন। বলতে পারেন, আমি আগে ভাগে ব্যক্তিগত হৃদ্যতার সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে এসেছি।

এককড়ি হেসে বললে, ভণিতা রেখে আসল ব্যাপারটা কি, বল ত মণি?

আগামী শুক্রবার আমাদের নারী কল্যাণ-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন এ-বছর এখানেই হচ্ছে, আশা করি অবশ্যই শুনে থাকবেন?

হাঁ, শুনেছি। মিসেস সুকল্যাণী মিটারের সঙ্গে তোমার মত একজন সর্বগুণান্বিতার মিলন যখন হয়েছে—

এককড়ির কথা শেষ হবার আগেই জলধি ব'লে উঠল, এককড়িদা, বলুন মণি-কাঞ্চন-যোগ হয়েছে। মণি'র বিভিন্নমুখী প্রতিভা আর মিসেস সুকল্যাণী মিটারের কাঞ্চন-মুদ্রা অর্থাৎ ধন-সম্পদ, দুইয়ে মিলে এবার সত্যই নারী জাগৃতির আলোড়ন ঘটবে আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।

এককড়ি বললে, আমরা একটু আগেই তোমাদের নারী-কাল্যাণ-সমিতির কথা আলোচনা করছিলুম। আমরা অর্থাৎ স্বদেশ-কল্যাণ-সমিতির সদস্যরা তোমাদের কাছাকাছি-পাশাপাশি থাকব মনস্থ করেছি। প্রয়োজনে আমাদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা পাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মণি।

আমি কিন্তু আপনাকে ও জলধিদাকে আরও কাছে, আমাদেরই একজন মনে করছি। যাক, যে-কথা বলতে এসেছি, অধিবেশন চলাকালীনই আমরা এ-গ্রামে একটা প্রসূতি

সদনের উদ্বোধন করতে আগ্রহী।

অতি উত্তম প্রস্তাব। এখান থেকে শহর প্রায় পনের মাইলে দূরে। সেখানে ছোট্ট একটা সরকারী হাসপাতাল রয়েছে বটে! কিন্তু সিট খালি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার তাছাড়া গরুর গাড়ী করে প্রসূতিকে দীর্ঘপথ নিয়ে যেতে—

চমৎকার প্রস্তাব মণি!

আমার একান্ত ইচ্ছা, সুকল্যাণীদিও সানন্দে সমর্থন করেছেন—প্রসূতি সদনটা আপনার মাতৃদেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত হোক।

জলধি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, সাধু প্রস্তাব। নাম হবে 'সুমতি প্রসূতি সদন।' সাধু! সাধু!

এককড়ি বললে, আমার মায়ের নামে প্রসূতি সদন গড়ে তুলবে, আমার দিক থেকে কোন আপত্তির কারণই থাকতে পারে না। আপত্তি তুলে অন্ততঃ কুপুত্র ব'লে নিজেকে জাহির করার এতটুকু উৎসাহও আমার নেই। উত্তম, আমার পূর্ণ সমর্থন রইল মণি। তবে হাঁ, তোমাদের সংস্থার, বিশেষ করে মিসেস সুকল্যাণী মিটারের এতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে কি?

বিশ্বাস করুণ, সুকল্যাণীদির দিক থেকেই প্রথম প্রস্তাবটা এসেছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে মণি এবার বললে, আর একটা অনুরোধ এককড়িদা, আগামী শুক্রবার, আপনাকে প্রসূতিসদনের উদ্বোধন করতে হবে।

জলধি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, আমি এ-প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

এককড়ি দু'হাত ঊর্ধ্বে উত্থিত করে বললে, শোন, শোন! ছেলেমানুষি কোরো না! আমি কি বলছি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। তোমরা প্রতিষ্ঠা করছ প্রসূতি সদন। তা-ও আবার আমারই মা'র নামে। এক্ষেত্রে আমার উদ্বোধন করতে যাওয়াটা একেবারেই দৃষ্টিকটু হবে। কোন সমাজ সেবিকা—ভাল কথা, মিসেস সুকল্যাণী মিটারই উদ্বোধন করুন না কেন। আমি বরং প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকব। মণি, তুমি আমার হয়ে ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। এটাই ভাল হবে, ওনাকে দিয়েই উদ্বোধন করাও।

ঠিক আছে, আপনার পরামর্শের কথা সুকল্যানীদিকে জানাব। হাঁ, তাই কর। আরে, শোভন-অশোভনের দিকটাও দেখতে হবে ত।

এককড়ির গৃহ-ভৃত্য গুড়গুড়ি দিয়ে গেল। এককড়ি নলটা মুখে তুলে পর পর কয়েকটা লম্বাটান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, মণি, তোমরা যে বিরাট কর্ম-যজ্ঞ শুরু করেছ, টাকা-পয়সা যা কিছু ত মিসেস সুকল্যাণী মিটারই খরচ করছেন, নাকি—

তা কেন হতে যাবে, সমিতির বিভিন্ন শাখা থেকে চাঁদা আসছে। মিঃ মিটারও পরিচিত মহল থেকে এককালীন দান স্বরূপ অর্থ সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের সাহায্য করছেন। আসলে ব্যবসার সূত্রে কলকাতার বহু ধনকুবেরের সঙ্গে ওনার প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে শুনেছি।

হাঁ, ভদ্রলোক খুবই করিত কর্মা। অমায়িক, সরল-সরল ব্যবহার দিয়ে মানুষকে আপন করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন।

জলধি বললে, সে সঙ্গে দেশ ও দশের জন্য কিছু করার মানসিকতাও থাকা চাই এককড়িদা, কি বলেন?

এককড়ি ঠোঁট থেকে নলটা নামিয়ে বললে সে-ত অবশ্যই। আর হবে না ভায়া ও'রা দু'জনই বিলেত ফেরতা।

মণি বললে, তবে অধিবেশনের মোট ব্যয়ের একটা বড় ভগ্নাংশ সুকল্যাণীদিই বহন করছেন।

চারদিক থেকে শতাধিক নারী-প্রতিনিধি আসছেন। ওদের সাতদিনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা। সম্মেলনের অন্যান্য খরচের কথা ছেড়ে দিলেও একশ'-সোয়াশ' লোককে সাতদিন খাওয়াতেই—

হাঁ এককড়িদা, মোটা টাকার ব্যাপার।

এককড়ি গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে বললে, তোমরা একটু বোসো মণি, আমি এক্ষণি আসছি। কথা বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরের দিকে গেলেন। মিনিট দুয়েবের মধ্যেই ফিরে এসে এক গোছা টাকা মণির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, মণি, এতে পাঁচ শ' টাকা আছে। তোমাদের আয়োজিত সুমহান যজ্ঞে এগুলো খরচ করলে খুশী হ'ব।

মণি হেসে টাকাগুলো নিয়ে বললে, আপনার মহত্বটুকু মাথা পেতে নিচ্ছি এককড়িদা।

একটা কথা মনে রাখবে, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করে নেবার যজ্ঞে তোমার এককড়িদার সার্বিক সহযোগিতা থেকে কোনদিনই বঞ্চিত হবে না বোন। আগামীকালের নতুন সূর্যকে নারীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পুরুষও স্বাগত জানাবে। নারীত্বের মহিমা ও গৌরব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক নতুন ভারতবর্ষ আত্মসচেতনার মধ্য দিয়ে জন্ম নিক নতুন সতী-সাবিত্রী। পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে আগামীকালের নতুন প্রভাতে সমান অধিকার নিয়ে নারী সদম্ভে মাথা উঁচু করে পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াক। হাসি—কান্না সুখ-দুঃখে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিক। আজ একটিমাত্রই প্রত্যাশা, আগামীকালের ফুটন্ত সকাল ত্বরান্বিত হোক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নারী-কল্যাণ-সমিতির অধিবেশনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মণি'র আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছে। সাইকেল নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করে অধিবেশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব ডেলিগেট আসছেন ওদের থাকা-খাওয়া আপ্যায়ণের দায়িত্ব বর্তেছে মণি'র

ওপর। শতাধিক মানুষ, বিশেষ করে সবাই মহিলা। থাকবেন সাতদিন। এদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যে সে কাজ নয়।

ডেলিগেটদের আপ্যায়ণ ছাড়াও মণি'র ওপর অতিরিক্ত একটা অলিখিত গুরু দায়িত্ব বর্তেছে। অধিবেশনের প্রথম দিনই 'সম্মৃতি প্রসূতি সদন'-এর উদ্বোধনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আসলে মণি একরকম জেদ করেই কাজটা শুরু করেছে। সংস্থার কয়েকজন সদস্যের ইচ্ছে ছিল, অধিবেশনে প্রসূতি সদনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে রাখা হোক। পরবর্তীকালে সুযোগ-সুবিধে মত সে প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করা যাবে। মণি আড়ালে সুকল্যাণী মিটারকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে রাজী করিয়েছে শুভকাজ বিলম্বে পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব ডেলিগেট আসছেন ওরা আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রসূতি সদন দেখে প্রেরণা পাবে, নিজ-নিজ গ্রামে এমন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে উদ্বুদ্ধ হবেন।

সুকল্যাণী মিটারের মনে মণি আগ্রহের সঞ্চার করতে পেরেছে। ওঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে অন্যান্য সদস্যারা সম্মতি প্রসূতি সদন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে সরাসরি বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্তকে হাসিমুখে স্বীকৃতি দেন। ব্যস, তারপরই মণি'র কাঁধে বাড়তি এই দায়িত্বের বোঝা চাপে।

মণি ঝোঁকের মাথায় প্রসূতি সদন গড়ে তোলার দায়িত্ব ত কাঁধে নিয়ে বসল। একে বাস্তব রূপ দিতে গেলে কোন কর্মঠ পুরুষের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন সম্ভব নয়। মাথায় একটা ফন্দি এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে জলধি'র শরণাপন্ন হ'ল। ও কাজ-পাগল মানুষ। যোগ্য সংগঠকও বটে। মণি ভালই যানে, ওর পক্ষে কোন কাজই অসাধ্য নয়। ওর দেশপ্রেম ও সমাজপ্রীতি নিখাদ। দশের হিতার্থে সর্বস্ব উজার করে দেবার মানসিকতার পরিচয় মণি ইতিপূর্বে বহুবারই জলধি'র মধ্যে পেয়েছে।

আর দেরী নয়। এনা'কে নিয়ে মণি সোজা জলধি'র মেসে হাজির হ'ল। প্রসূতি সদন গড়ার কাজে সাহায্য প্রার্থনা করল। মণি'র প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে ওর সাধ্য কি? ব্যস, জলধি কোমড়ে গামছা বেঁধে লেগে গেল বাঁশ-খুঁটি দড়িদড়া সংগ্রহের কাজে। গ্রামের মানুষ সাধ্যমত বাঁশ-খুঁটি ও খড় প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করল। শুধু কি তা-ই নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই গ্রামবাসীরা প্রসূতি সদন তৈরী করার কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিতেও কুণ্ঠিত হ'ল না। পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু হয়ে গেল।

জলধি স্নানাহার ভুলে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদ্বির করতে লাগল। লম্বা একটা হলঘর মত তৈরী হবে। পাশে বাঁশের বেড়া আর খড়ের ছাউনি। দশটা চৌকি যাতে ভালভাবে পাতা যায় ঘরটা মোটামুটি সেরকম মাপের তৈরী হচ্ছে। চৌকির ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরাই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে একটা করে চৌকি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জলধি অতন্দ্রপ্রহরীর মত সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কর্মীদের কাজ দেখাশোনা করছে। এমন সময় মণি'র সহকারী এনা সেখানে হাজির হ'ল। জলধি'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল

মুচকি হেসে বললে, এপথ দিয়ে যেতে গিয়ে ভাবলুম, আপনার কাজ কতটা এগিয়েছে দেখে যাই।

জলধি রসিকতা করে বললে, এসেই যখন পড়েছেন, না দেখে যাবেনই বা কি করে।

এনা মুখে বিদ্রূপের হাসিফুটিয়ে বললে, মণিদির প্রস্তাব শুনে আমি কিন্তু সেদিন মনে মনে হেসেছিলুম জলধিবাবু।

জলধি হেসে বললে, কোন প্রস্তাব? এমন কি প্রস্তাব মণি দিয়েছিল যে, আপনার হাসির উদ্রেক ঘটেছিল?

এনা মুখের হাসিটুকু অক্ষুন্ন রেখেই বললে, মানে আপনার মত একজন অকৃতদার পুরুষের ওপর প্রসূতি সদন তৈরীর দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারটার কথা বলছি।

জলধি হেসে বললে, কেন ভরসা হচ্ছিল না বুঝি?

মোটেই না।

এখন আপনার সে-ধারণাকে ভ্রান্ত ব'লে মনে হচ্ছে ত?

হাঁ, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।

সাফল্যের পুরস্কার কিছু আশা করতে পারি কি?

সেটা অবশ্য ভেবে দেখার ব্যাপার।

দয়া করে সে-ভাবনাটা একটু তাড়াতাড়ি—পুরস্কার বা তিরষ্কার—

জলধি'র কথা শেষ করতে না দিয়েই এনা বলতে বলতে হাঁটা দিল, হয়ত শেষেরটাই—

তারপরের বক্তব্য জলধি শুনতে পেল না। নীরবে ভাব-বিমুগ্ধ চোখে এনার ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

অদূরে মণি'কে সাইকেল চেপে আসতে দেখা গেল। রাস্তার ধারের বটগাছটার নীচে সাইকেল থেকে নামল। ইদানিং পাড়ায় পাড়ায় ওর কিছু ভক্ত যোগার হয়েছে। অতি অল্প বয়সের বালক-বালিকা ওর সাইকেলের ঘণ্টা শুনলেই, বা দূর থেকে চলমান শোলার টুপিটা দেখলেই হৈ হৈ করে সবাই এসে রাস্তায় ভিড জমায়। আর মণিও হাসিমুখে কুশল সংবাদাদি নেয়, ব্যাগ থেকে লজেন্স বের করে সবার হাতে একটি করে তুলে দিয়ে হাসিমুখে সাইকেলে চাপে।

জলধি দূর থেকে মণি'কে পুরনো অশ্বত্থ গাছটার তলায় সাইকেল থেকে নামতে দেখল। কয়েক মুহূর্ত পরে আর সেখানে দেখতে পেল না। অবাক হ'ল। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে কর্পূরের মত হাওয়ায় উবে গেল নাকি!

জলধি আবার কর্মীদের দিকে মন দিল।

মণি পাশের এক চাষী-পরিবারের বাড়ি গিয়েছিল। যে-সব ছেলে-মেয়ে অশ্বত্থ-গাছের তলায় ওকে ঘিরে জমায়েত হয়েছিল আচমকা ওদেরই একজনের বাড়ি গিয়ে হাজির হ'ল। ছেলেটার বয়স বছর আটেক বয়েস। দেখলে চার-পাঁচ বছরের বেশী মনে হয় না। রিকেট রোগীর মত চেহারা। হাত-পা গুলো কাঠি কাঠি। শরীরের তুলনায় মাথা আর পেটটা অস্বাভাবিক বড়। খালি গা, পরণে ছেঁড়া একটা ইজের প্যান্ট। বুকের

হাড় ক'টা অনায়াসে গুণে নেয়া যায়। মণি ছেলেটার সঙ্গে সোজা ওর বাড়ি গিয়ে হাজির হ'ল। খবর নিয়ে জানতে পারল, ছেলেটার বাবা মাঠে চাষের কাজে গেছে। নিজের জমি নয়। অন্যের জমিতে মজুর খাটে। ওর বৌ ছ'-সাত মাসের একটা শিশুকে বুকের দুধ দিচ্ছে, আর লতাপাতা দিয়ে মাটির হাড়িতে ভাত রান্না করছে। শিশুটা দুধ কতটা পাচ্ছে, সে-ই জানে। একটা ডাঙা কুলোতে কিছু কলমি-শাক কুঁচনো পাশে পড়ে। রান্নার আর কোন উপকরণ নজরে পড়ল না। বছর তিনেকের একটা মেয়ে দাওয়ার এক কোণে বসে ভাতের জন্য ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আচমকা অপরিচিত মণি'কে উঠোনে দেখে আকস্মিক ভয়-ভীতিই হোক আর বিস্ময়েই হোক কান্না থামিয়ে ছুটে গিয়ে মা'র পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপার কিছু একটা ঘটেছে মনে করে ওর মা ঘাড় ঘুরিয়েই মণি'কে উঠোনে দেখে যন্ত্রচালিতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। ছেঁড়া কাপড়টাকে টানাটানি করে সাধ্যমত লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করল। কঙ্কালসার দেহ। চোয়াল ভাঙা, চোখ দুটো গর্তে বসা। মাথার চুল রুক্ষ। কবে, কতদিন মাথায় তেল দিয়েছিল, হিসেব করে বলতে পারবে না হয়ত।

মণি কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে অকালবৃদ্ধ, জরাজীর্ণ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মহিলাটি আকস্মিক বিস্ময়টুকু কাটিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, কাকে চাই? আপনি কি কিছু বলবে গো মা?

মণি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললো বিশেষ দরকারে আপনার বাড়ি পর্যন্ত আসতেই হ'ল. কিছু মনে করবেন না যেন।

তা না হয় হ'ল। কিন্তু আমি ত আপনার কোন দরকার মেটাতে পারব নি। খোকার বাপ মাঠে গেছে, ফিরে না এলে--

মণি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললে, খোকার বাপ নয়, দরকার আপনার সঙ্গেই।

মহিলাটি আর কোন কথা না বলে ছেঁড়া একটা বস্তা এনে দাওয়ায় পেতে দিয়ে বললে, আপনি আগে এখানে বস গো মাঠাকরুন।

মণি বস্তাটা গোছগাছ করে বসতে বসতে বললে, আপনার সঙ্গে ক'টা কথা বলতে চাই, অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।

কি কথা? কি বলবে, আপনি—

আচ্ছা, আপনার বয়স এখন মোটামুটি কত?

বুঝা গেল মহিলাটি বড়ই বিব্রত বোধ করছেন।

মণি'র মুখের দিকে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝেতে ঘঁষে চলেছে।

মণি বুঝল অসুবিধে কোথায়। তাই নিজেই বললে, দু'কুড়ি হবে কি?

তা-ত ঠিক বলতি পারব নি। তবে মা'র মুখে শুনেছি, পঞ্চাশ সনে যে আকাল

হয়েছিল, তার আগের বছর মোর জন্ম।

মণি হিসেব করে বুঝল, মহিলাটির বয়স মোটামুটি ত্রিশ বছর। ওর এবারের প্রশ্ন—আপনার ছেলেমেয়ে ক'টা দয়া করে বলবেন কি ?

মহিলাটি কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে বললে, তিন ছেলে, আর চারটি মেয়ে। এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লে চারটি ত নষ্টই হয়ে গেছে। নইলে আজ ঘর জোড়া থাকত গা মাঠাকরুণ!

আপনি অভয় দিয়েছেন তাই বলছি, তারপর ? এই সাতটি ছেলেমেয়ে, খাওয়া-পরা মানুষ করার কথা কিছু ভেবেছেন।

মহিলাটি স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল, যিনি এদের পাঠিয়েছেন। চিন্তে ত তেনার গো। মোরা বিরথা চিন্তে করে কি করব, কও দেখিনি। মোরা কষ্ট করে গাছ লাগাতি পারি। ফল দেয়া, টিকিয়ে রাখা ত তেনারই কাজ গো। সার কথা, মুখ দিয়েছেন যিনি তিনিই আহার যোগাবেন।

দেখুন, এসব পুরণো কথা। দিনকাল বদলাচেছ। আমাদের চিন্তা ভাবনারই পরিবর্তন আনতে হবে। অধিক সন্তান দৈন্য অশান্তির কারণ। ধরুন, আপনি যদি দুটো সন্তানের মা হতেন তবে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলতে পারতেন। তবে আর এদের চেহারাও এমন কঙ্কাল সার হ'ত না, আপনিও জীবনীশক্তি হারিয়ে এমন ধুঁকতেন না।

সবই অদেষ্ট।

না, অদৃষ্টকে মিছে দায়ী করবেন না। শিশুগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মণি এবার বললে, তাই যদি হয়, তবে এদের এ-দুরবস্থার জন্য কার অদৃষ্টকে দায়ী করবেন, এদের, নাকি আপনাদের অদৃষ্টকে ? আমি কি বলছি শুনুন, মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজেই গড়ে তোলে। আপনার আর বেশী সময় নষ্ট করব না। আমার অনুরোধ, আপনাদের বিশেষ করে সে-নিষ্পাপ শিশুগুলোকে পৃথিবীতে ডেকে এনেছেন এদের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার থেকে আপনাদের সচেতন হতে হবে। এদের কি অপরাধ বলতেন পারেন ? দুবেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারেন না, পরনের কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হয় না। এতেও কি আপনাদের—

তা আমি কি করতে পারি কও দেখিনি ?

হাঁ পারেন, পারতে আপনাকে হবেই। অন্ততঃ এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে, সুখী ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ে তোলার জন্যই আপনাদের উভয়কেই সংযত হতে হবে, থাকতে হবে সতর্ক।

খোকার বাপ যদি—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মণি বলে উঠল, খোকার বাপকে আপনি বুঝাবেন। প্রয়োজনে আমরা, নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে পরে ব্যাপারটা বিবেচনা করব। কথা বলতে বলতে ব্যাগ খুলে এক শিশি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বের করে মহিলাটির

হাতে দিয়ে বললে, সাতদিন পরপর রাত্রে শোবার সময় দুটো করে বড়ি খাবেন। আমি একমাস পরে আবার আসছি।

মহিলাটি শিশিটি কাপড়ের আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে, কথা দিতি পারতিছি না। খোকার বাপ যদি মানতি না চায়—

মানবেন। আপনি বুঝাবেন। আপনি ওনাকে বুঝমানাবেন। উঠতে উঠতে বললে, আজ তবে উঠি। আপনার কাজের সময়ে এসে—আচ্ছা, একমাস পরে আবার দেখা হচ্ছে। নমস্কার জানিয়ে মণি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

সাইকেলের ঘণ্টা শুনে জলধি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে মণি সাইকেল থেকে নামছে।

জলধি বললে, তুমি যে কখন, কোথায় যাও, ভেবে পাইনে।

মণি মুচকি হেসে বললে, কেন, কি হ'ল জলধিদা?

না, হয় নি কিছু। আধ ঘণ্টা আগে দেখলুম, বাচ্চাদের নিয়ে হৈ চৈ করছ। ব্যস, পরমুহূর্তেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একেবারে বে-পাত্তা। চোখের পলকে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলে—

মণি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললে, হাঁ, পাশের একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম।

একটু আগে তোমার বাহনটি এসেছিলেন।

কে? এনা এসেছিল বুঝি?

হাঁ।

কিছু বললে? আমার খোঁজ করছিল?

কার খোঁজে এসেছিলেন, বলা মুসকিল।

তবে হয়ত আপনার খোঁজে এসেছিল। মণি গালটিপে হেসে বললে।

আমার খোঁজে আসতে যাবেন কেন?

আমার খোঁজ করারও ত কথা নয়। আমি এবেলা কখন, কোথায় যাব, কি কি কাজ, সবাই জানে। তার মধ্যে এখানে আসার কথা মোটেও ছিল না। নেহাৎ সময় পেয়ে গেলুম—যাক, কি বললে?

বললেন ত অনেক কিছুই। যাবার আগে আমার গায়ে হুল ফুটিয়ে চলে গেলেন।

হুল ফুটিয়ে গেছে? বুঝলুম না ত! মণি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে জলধির দিকে তাকিয়ে রইল।

জলধি বললে, কি বললে জান? বললে, মণিদিরও আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, আপনার মত এক অকন্দারের ওপর প্রসূতি সদন তৈরীর দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজ যা হবে বুঝাই যাচ্ছে!

মণি সরবে হেসে উঠে বললে, তাই বুঝি? এনা এ-কথা বললে। এবার হেসে বললে, হুল যাদের আছে তারা কিন্তু কামড়াতে পারে না জলধিদা। এনা তবে এখানে এসেছিল?

তবে আর বলছি কি !

মণি হাসি থামিয়ে বললে, তবে ত আপনার 'অকৃতদার' বদনামটা ঘুচাতেই হয় দেখছি। জলধিদা, এনা মেয়েটা কিন্তু সব দিক থেকেই ভাল। দেখতে খুব সুশ্রী না হলেও কুৎসিৎ বলা চলা না।

জলধি নির্বাক।

মণি ব'লে চলল আমি বলছি জলধিদা, টোপ ফেললেই বঁড়শিতে গেঁথে ফেলতে পারবেন।

জলধি বললে, হাঁ, বুঝলুম, ও রকম আর একটি মেয়ে এ-তল্লাটে খুঁজে পাওয়া ভার, এ-কথাই ত বলতে চাইছ ?

অবশ্যই। রূপের দিক থেকে না হলেও গুণের দিক থেকে ত অবশ্যই। জলধিদা আর কতদিন মেসের চৌকিটা দখল করে রাখবেন, বলুন ত ? বিয়ে থা করে ঘর সংসার পাতুন। সব মানুষের ত একটা কিছু অবলম্বন--

মণি'র মুখের কথা শেষ হবার আগেই জলধি বললে, মণি, তোমায় যদি চলে তবে আমারই বা চলবে না কেন ?

মণি নীরবে পাশ ফিরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘরামিদের কাজ দেখতে লাগল।

জলধি এবার বুঝতে পারল, অসতর্ক মুহূর্তে ও মণি'র ক্ষতস্থানে আঘাত হেনে ফেলেছে। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হ'ল। কিন্তু উপায়ও ত কিছু নেই। তীর হাত ছাড়া হয়ে গেছে। অনন্যোপায় হয়ে চুপ করে রইল।

মণি সদ্য তৈরী ঘরটার চারদিকে নীরবে ঘুরে ঘুরে ঘরামিদের কাজকর্ম দেখল। তারপর তেমনি নীরবে সাইকেল চেপে এগিয়ে গেল।

জলধি ওর ফেলে যাওয়া পথের দিকে নীরব দৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাকডাকা সকালে মণি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

সকাল আটটায় নারী-কল্যাণ-সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা। পরবর্তী অনুষ্ঠান দশটায়। সুমিত প্রসূতি সদনের উদ্বোধন হবে এখন।

মণি কোন রকমে চোখে-মুখে জলের ছিঁটে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মাথায় বিরাট দায়িত্ব। অধিবেশনের সাতদিন ওর নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে না। যদিও স্বেচ্ছাসেবকদের তদারকি থেকে শুরু করে ডেলিগেটদের আদর-আপ্যায়ণ প্রভৃতি কাজের দায়িত্বভার সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন সদস্যার ওপর অর্পিত হয়েছে, তবু সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ওকে খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে কার, কোথায় অসুবিধে। সুকল্যাণী মিটার ওর ওপর খুবই নির্ভর করছেন। তবে একথাও ঠিক, এককড়ি ও জলধি থেকে

শুরু করে স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্য কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এদের বার্ষিক অধিবেশনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্য প্রয়াসী।

উদ্বোধনী-অনুষ্ঠান শুরু হবার আধঘণ্টা আগেই অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গণ উৎসাহী গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে গিজগিজ করতে লাগল।

স্বেচ্ছাসেবী ও সদস্যাদের আন্তরিক প্রয়াসে অনুষ্ঠানের কাজকর্ম সবই যেন জ্যামিতিক ছকের মত পরিচালিত হচ্ছে। সবই সুপরিকল্পিত। জ্যামিতির ছকের মতই সুছন্দিত, সুশৃঙ্খল আর সুষমামণ্ডিত।

অনুষ্ঠানে যারা যোগদান করেছে, সবাই এসেছে উদার পরোপকারব্রতী মন নিয়ে গ্রামোন্নয়ন, আর সমাজ সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে।

যথা সময়ে অধিবেশনের উদ্বোধনী-অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। উদ্বোধক শ্রীমতী সুকল্যাণী মিটার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন—আজ সমাজসেবার মন নিয়ে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। মানব প্রেমই বলেন আর দেশপ্রেমই বলেন, যে-ভাষাতেই, একে ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, আমরা জানি, সর্বস্ব উদার করে অন্যের জন্য, দেশ ও দশের জন্য কোন কিছু করার মানসিকতার নামই ত মানবপ্রেম আর দেশপ্রেম। আমাদের, অর্থাৎ নারী-কল্যাণ-সমিতির সদস্যাদের সঙ্গে যোগ্য আত্মত্যাগের যথারীতি সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে পারলেই আমাদের প্রয়াস সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সমাজসেবামূলক পরিকল্পনা যা কিছু আমরা গ্রহণ করতে চলেছি তাদের বাস্তবায়িত করতে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াস ভিন্ন কিছুতেই সম্ভব নয়। যদিও নারীই উদ্যোগ নেবে, তাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে কাঁধ লাগাবে পুরুষ।

নারী ছাড়া পুরুষ যেমন অপূর্ণ, ঠিক তেমনি পুরুষ ছাড়া নারীও অপূর্ণ থেকে যায়।

আমরা এতদিন হুজুগ আর বুজরুকিতে মেতে ছিলুম। আমাদের আত্মসচেতনা বোধ ছিল বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে। আমাদের কথা আর কাজের মধ্যে ফাঁক ছিল বিস্তর। আসলের চেয়ে খাদই ছিল বেশী। দেশ ও সমাজ ক্রমেই মহাশ্মশানের রূপ নিতে চলেছে। আমরা তিলে তিলে এগিয়ে চলেছি ধ্বংসের দিকে। যেদিকে তাকাই শুধুই অবক্ষয়ের চিহ্ন দাঁত বের করে উপহাস করে সমগ্র দেশবাসীকে। আর ফাঁকা বুলিতে আমরা ভুলব না। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে চাই একনিষ্ঠ মন আর ঐকান্তিক সাধনা। সে সাধনা ত আত্মত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধ হতে পারে না। তাই নারী-পুরুষ সবাইকে সাদরে আহ্বান জানাই, আজ বুজরুকি ছেড়ে সবার কাছে, সবার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে দ্বিধাহীন মন নিয়ে। সবাই ব্রতী হতে হবে শোষণ হীন, বিভেদহীন সুনির্মল আগামীকালকে স্বাগত জানাতে।

পৃথিবীর যেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন, দেখতে পাবেন সর্বত্র নারী-জাগরণের জোয়ার বয়ে চলেছে। পুরণো বস্তাপচা সমাজ-ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে নতুনের ব্রতে সবাই আজ ব্রতী। আমরা? ভারতবর্ষের নারীরা? আমরা কি আজও উট পাখীর

মত বালিতে মুখ গুঁজে থাকব? আজকের মত আগামীকালও কি আমরা চোখে ঠুলি পড়ে থাকব? আর অসহায়-আর্তের মত অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেব? না, আমরা আর হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না। অন্ধকার রাত্রিকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে আগামীকালের সূর্য কিরণোজ্জ্বল ঝকঝকে চকচকে সকালকে স্বাগত জানাব। অন্তরের অন্তঃস্থলের সবটুকু শ্রদ্ধা নিঙড়ে নিয়ে নিবেদন করব রক্তিম সূর্যকে। আসুন, আজকের পবিত্র সকালে আমরা এই প্রতিজ্ঞাই করি, নারীর প্রাপ্য ফিরিয়ে আনব। সমান মর্যাদা, সমান অধিকার নিয়ে পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব নিয়ে অবশ্যই নয়। বরং সহযোগী ও সহমর্মী হয়ে! অতীত ও বর্তমানের ক্লেদ আর গ্লানি ভুলে নারী-পুরুষ একজোট হয়ে আগামীকালকে মধুময় করে তুলি।

উদ্বোধক সুকল্যাণী মিটারের পর মঞ্চে এল মণিমালা। ওর ওপর দায়িত্ব বর্তেছে ভারতবর্ষীয় সমাজে নারীর বর্তমান স্থান ও নারীর স্বাধিকার ফিরিয়ে আনার উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

মণি ওর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললে, নারী তার আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। জ্যোৎস্না-রাত্রির বিনিদ্র চন্দ্র যেন নারীর সুরে সুর বেঁধে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করেছে। পৃথিবীতে যদি নারীর অস্তিত্ব না থাকত তবে চন্দ্র ও সূর্যের উদয় যেন নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়ে যেত। আর ব্যর্থ হ'ত গাছে গাছে ফুলের সমারোহ। আমরা জানি, পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে কানাচে অর্থাৎ সব রকম সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নারী অর্ধেক মানবী আর অবশিষ্টটুকু কল্পনারূপে পুরুষের চিত্তে অধিষ্ঠিতা। কিন্তু আজ ভারতবর্ষের নারীর স্থান কোথায়? নারী কি পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক—যাবতীয় বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেকে জাহির করতে পারছে? নারী পেরেছে কি সনাতন কল্যাণ-আদর্শের বিষময় বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যের জয়গানে মুখর হ'তে? দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে নারীর সত্তাকে বলপূর্বক কণ্ঠরোধ করে নির্জীব করে রেখেছে। সুদূর অতীতের দিকে আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি তবে আমাদের সামনে এমন এক সুসংহত সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটে উঠবে যা সামঞ্জস্যে মহীয়ান জীবনের পূজারী। তাই ত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনে মানুষের সার্বিক বিকাশের ছিল অবকাশ। আজকের মত সত্য, শিব ও সুন্দরকে নির্বাসিত করে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সমাজ নারী ও পুরুষের জীবনাদর্শকে এমন পঙ্কশয্যায় নিমজ্জিত করে রাখে নি।

সীতা, সাবিত্রী আর সতীর দেশ এই ভারতবর্ষ। একদিন এদেশের মহিমামণ্ডিত নারীসমাজের ঐতিহ্য সমগ্র বিশ্বের কাছে ছিল উদাহরণস্বরূপ। আর আজ? ভারতীয় নারী শুধুমাত্র পুরুষের লীলাসঙ্গিনী—হাতের পুতুল। সীতা, সাবিত্রী ও সতীকে আজ পুরুষরা কেবলমাত্র উর্বশীরূপে দেখে থাকে। 'সহধর্মিনী' শব্দটি পুরুষের অন্তর থেকে ধুয়ে-মুছে ম্লান হয়ে গেছে। পতি-পত্নীর সম্পর্ক অনেক পরিবারেই খুঁজতে

গিয়ে নির্মমভাবে হতাশ হতে হয়। একদিন যে নারীকে শান্ত, সৌম্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর—একাধারে এই পঞ্চরসেরই আশ্রয় বলে গণ্য করা হ'ত। আজ তারাই পুরুষের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র দাসীরূপে গণ্য করে বিশ্বের সমগ্র নারীসমাজকে অবমাননা করা হচ্ছে। আমরা একটু লক্ষ্য করলে প্রতিদিনই শুনতে পাই নারী নির্যাতনের বহু করুণ কাহিনী। অধিকাংশ সংসারে নারী কি ধরণের আচরণ পাচ্ছে? প্রতিদিন অবহেলা, অপমান ও বর্ণনাহীন অত্যাচারে আমাদের চারদিকে বহুনারী মৌন বেদনায় জর্জরিত হচ্ছে। বিভিন্ন অনুশাসনে শৃঙ্খলে যেমন, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি', 'নারী নরকের দ্বার', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী' ও নারী বিত্তের কারণ' আবদ্ধ করে মানুষের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জীবনের বৃহত্তর পরিধি থেকে নারীকে অন্তরালে দূরে রেখে দাক্ষিণ্যহীন অন্ধকারারূপ ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, এই কি নারীর উপযুক্ত মূল্য?

আমরা সতীত্ব হানির কথা প্রায়ই শুনতে পাই বটে। কিন্তু ভুলেও কি কেউ কোনদিন পতির পতিত্বহানির কথা শুনেছেন। কি করেই বা শুনবেন? পুরুষেরা যে ধোয়া তুলসী-পাতার মতই সদা নির্মল। আজকের সমাজে নারীর বিশেষ পরিচয় সন্তানধারণের অসহায় যন্ত্রস্বরূপে। গ্লানিময় অবহেলিত পরাধীন জীবনকে একান্ত নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়ে শত নির্যাতন সইতে হচ্ছে, অনন্যোপায় হয়ে গোপন অন্তরালে নীরবে চোখের জলে বুক ভাসাতে হচ্ছে। প্রতিবাদের ভাষা নেই, প্রতিবাদের কোন অস্ত্রই নারীর হাতে তুলে দেয়া হয় নি। দিনের পর দিন বছরের পর বছর নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুরতম নির্যাতন সহ্য করে করে কোন কোন নারী প্রস্তরবৎ হয়ে গেছে। পাথরকে আছাড় মারলে আওয়াজ হয় কিন্তু শত আঘাতেও প্রপীড়িত নারীর মুখ থেকে টু-শব্দটিও বেরোয় না। কিন্তু নারীর শরীরও রক্ত-মাংস-মেদ মজ্জার সমন্বয়ে গঠিত। সহ্যেরও একটা সীমা আছে, ধৈর্যও ত সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা, প্রবঞ্চিতা নারীর ধৈর্যের বাঁধ একদিন না একদিন ভেঙ্গে যায়, তখনই তিলে তিলে গড়ে তোলা সংসার, স্বামী, পুত্র, কন্যা সবার স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধন জোর করে ছিন্ন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়। ভাবতে পারা যায় জীবনের প্রতি কতখানি বিতৃষ্ণা জন্মালে একজন মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে? বলুন? বলুন আপনারা, এর কি কোন প্রতিকারই নেই?

পুরুষ যদি বিবাহিত জীবনে সুখী না হয় তবে অনায়াসেই দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে পারে। ভালো, আরও ভালো—অর্থাৎ ভালোর যেমন শেষ নেই, তেমনি সুখ ও তৃপ্তিও অন্তহীন। তাই অধিকতর সুখ ও আত্মতৃপ্তির মোহে পুরুষেরা এক স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও নির্লজ্জের মত ঘটা করে অন্য আর এক স্ত্রীকে হাসি মুখে ঘরে নিয়ে আসে। ভুলেও একবার ভেবে দেখার প্রয়োজনবোধ করে না যাকে একদিন পত্নীর সম্মানে ঘরে নিয়ে এসেছিল। এতদিন যাকে নিয়ে ঘর করল ওর কতটুকু সম্মান দিল, কতটুকু সমবেদনা প্রদর্শন করল? কিন্তু অসম্মানিতা, পদদলিতা, লাঞ্ছিতা

যে-অভাগিনীকে মুখ বুঝে শত অপমান সহ্য করেও সে-পাষণ্ডরই ঘর করতে হবে, দাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবনকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে স্বামীরূপী পশুর পূজায় লিপ্ত থাকতে হবে? কিন্তু কেন এ-অবিচার? নারীকে সামাজিক কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে বলির জন্য উৎসর্গীকৃত পশুর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন? আমরা কি প্রপীড়িতা লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা নারীকে আত্মরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। পারি না কি বিবাহ-বিচ্ছেদের হাতিয়ার তুলে দিতে? আমরা আজ আছি. আগামীকাল হয়ত নাও থাকতে পারি। কিন্তু আমাদের উত্তর সূরী যারা থাকবে ওরা ত অন্ততঃ নিশ্চিন্ত ও সুখময় ভবিষ্যৎ-জীবন যাপন করতে পারবে। আমরা আজকের সভায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' আইন প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন করব। প্রয়োজনে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতেও ইতস্ততঃ করব না।

এবার আলোচনা করা যাক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব মহিলাকর্মী কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন, ওদের প্রতি বঞ্চনার বিষয়। আমরা জানি একই প্রতিষ্ঠানে একই কর্মে নিযুক্ত পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের মধ্যে বেতন হারের মধ্যে দারুণ বৈষম্য রয়েছে। সমশিক্ষা ও সমযোগ্যতা সম্পন্না নারীকর্মী শ্রম বিনিয়োগ করে মাসান্তে পুরুষকর্মী অপেক্ষা নারীকর্মীরা অনেক, অনেক কম বেতন হাতে পান। কেন এই বৈষম্য? এতে কি সমগ্র নারীজাতির প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা ও অবিচার প্রদর্শন করা হচ্ছে না? সরকারের এই নারীর শ্রমশোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও আমরা আজকের সভায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

আর একটি দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি, পৃথিবীর অন্যান্য সব সভ্যদেশে নারী-শ্রমিকদের জন্য প্রসবকালীন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নারীকর্মীরা এই বিশেষ সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে অর্থাভাবে প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশু উভয়কেই উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্টিরোগের শিকার হতে হয়। যারা শাসনের নামে আমাদের দেশে বল্গাহীন অপশাসন চালাচ্ছে সেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দেশেও ত নারীকর্মীরা প্রসবকালীন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কেন ভারতবর্ষের নারীদের প্রতি এই নির্লজ্জ বঞ্চনা আমরা এই বিশেষ দিকটির প্রতিও বহুবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমাদের আবেদন-নিবেদনকে দারুণভাবে অগ্রাহ্য করে সমগ্র নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করেছে, করেছে অন্যায় অবিচার। এমতাবস্থায় আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইংরেজ সরকার আমাদের আন্দোলনের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আপনাদের কাছে নারী কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি, আপনারা আমাদের নারীজাগরণের সংগ্রামে সাথী হোন। এমনও হতে পারে হয়ত আমরা সেদিন এই পৃথিবীতে থাকব না যেদিন অত্যাচারী দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গ সরকারের অবসান ঘটবে, আমাদের বাঞ্ছিত স্বরাজ লাভ সম্ভব হবে। তবে এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে অন্ততঃ যেতে পারব আগামীকাল আমাদের

উত্তরসূরীরা আমাদের সংগ্রামের ফল ভোগ করবে। আগামীকালের নারীরা ভোগ করবে শোষণহীন, বঞ্চনাহীন ও নিপীড়নহীন সুখী জীবন। নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা লাভে ধন্য হবে।

এই ত গেল একটা দিক। আবার অন্য আরও বহু কর্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে যার ফলে সমাজকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা সম্ভব। আমাদের সঠিক প্রয়াসে যে সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে তাকে অনায়াসেই সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ করে তুলতে পারি।

আমরা নারী কল্যাণ সমিতির সদস্যারা ত্রিশটা মৌজা ঘুরে যে চিত্র দেখেছি তার একটি সংক্ষিপ্ত বাস্তব চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দশটি মৌজা মিলে একটা মাত্র পাঠশালা রয়েছে। ঘর বলতে বাঁশ মাটিতে ঘেরা কিছুটা জায়গামাত্র। নামেই স্কুল-বাড়ি। বসবার বেঞ্চের ত প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি সামান্য ব্লাক-বোর্ড বা অন্যান্য উপকরণের নাম গন্ধও নেই। ছাত্ররা নিজেরাই যে, যার বাড়ি থেকে তালপাতার চাটাই নিয়ে আসে। ত্রিশটা মৌজায় প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে মোট দু'শ পঞ্চাশ জন' ম্যাট্রিকের গন্ডী পেরিয়েছে মাত্র পঁচিশ জন। গ্রাজুয়েট হয়েছে মাত্র সাতজন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে দুটো মাত্র মেয়ে ম্যাট্রিকের চৌকাঠ ডিঙোতে পেরেছে। লোক গণনার হিসেবে দেখা যায় ত্রিশটি মৌজার মোট লোক সংখ্যা পাঁচ হাজার। এই যদি গ্রামের চিত্র হয় তবে কি এটা আমাদের কাছে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় নয়?

রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথা আশা করি আপনাদের কাছে বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আর দেখেছি, যেখানে সেখানে এঁদো পুকুর আর ডোবা, কচুরীপানার জন্য যাদের জলের অস্তিত্বটুকুও চোখে পড়ে না। ম্যালেরিয়ার রোগজীবানুবাহী মশার নিশ্চিন্ত বাসস্থল এই সব জলাশয়।

পনের মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতালও নেই-ই, এমন কি একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রও নেই যেখানে আমার মা-বোনদের প্রসবকাল সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা গ্রামের মানুষ ভাবতেই পারে না। অন্ততঃ দশ-বারোটি করে সন্তানের জন্ম দিয়ে মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেই অপুষ্টি রোগের শিকার হয়ে ধুঁকছেন। মায়ের মত শিশুদের অবস্থাও শোচনীয়। চোখ কোটরাগত, প্লীহাময় দেহ উদর সর্বস্য, মাথাটা অস্বাভাবিক রকম বড, হাত-পা কাঠি কাঠি। স্বামী ত্যাগিনী কোন নারীই ত্রিশটা মৌজার মধ্যে নেই। কিন্তু একাধিক, স্ত্রী বর্তমান এমন পুরুষের সংখ্যা অন্ততঃ পঁচিশ জন। মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, শতকরা পচানব্বই জনেরই নিজের একতিলও জমি জিরাত নেই, অন্যের জমিতে কাজ করে কোনরকমে পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রেখেছে মাত্র। তা-ও আবার বছরের মধ্যে ছ'মাসই কাজ থাকে না। কুটির শিল্প গড়ে তুলতে পারলে কোন রকমে নুন-ভাতের যোগার হতে পারত।

আমাদের নারী-কল্যাণ-সমিতিকে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করতে

হবে। যে কোন মূল্যে সে- কর্মসূচীকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। নারীকে ভুলে যেতে হবে সে পুরুষের দাস। ভুলে যেতে হবে কর্মফল অদৃষ্টই ওর জীবনের দৈন্যদশার কারণ। মানুষ নিজের ভাগ্যকে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ওর জন্য চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আগ্রহ ও অধ্যবসায়। আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনকে বেছে নিয়েছেন। দু'-চারজন সৌভাগ্যবান, যারা উচ্চশিক্ষায় ধন্য হয়েছেন গ্রাম ছেড়ে শহরে গিছে উন্নত জীবন যাপনের উৎসুক হয়ে পড়েছেন। এই মানসিকতাই যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হয় তবে গ্রামের অসহায় মানুষের অশিক্ষার অন্ধকার কে দূর করবে, কে-ই বা নরককুন্ডকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করবে? আমাদের এই চরম দুঃসময়ে কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়ে আসর মাত করলে চলবে না। হাতে কলমে কাজ—হাঁ, হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে হবে।

এককড়িবাবু প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘের কাছ থেকে আমরা সার্বিক সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। স্বদেশ কল্যাণ সংঘ এবং নারী কল্যাণ-সমিতির যৌথ উদ্যোগে, নারী পুরুষ হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সমাজসেবা মূলক কাজ গুলিকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সম্পন্ন করতে ব্রতী হ'ব। এরই আদর্শের টানে ঝাঁপিয়ে পড়ব পরিকল্পিত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করে আগামীকালের নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাতে। জমাবাঁধা সর্বনেশে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আলোর সন্ধান দিয়ে যেতে হবে আগামীকালের মানুষকে, তবেই আমাদের পরাধীনতার গ্লানিটুকু ধুয়ে-মুছে গিয়ে মুক্তির বার্তা নিয়ে আসবে। আর এরই মধ্য দিয়ে বহু আকাঙ্খিত স্বরাজ আসবে আমাদের হাতের মুঠোয়।

এবার শুরু হ'ল 'সুমতি প্রসূতি সদন'-এর উদ্বোধন-পর্ব। স্বদেশ-কল্যাণ-সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী এককড়ি মুখার্জীর উপস্থিতিতে ত্রিশখানি মৌজার নারী পুরুষদের ঐকান্তিক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নারী কল্যাণ সমিতির অধ্যক্ষা ও সমাজসেবিকা শ্রীমতী সুকল্যাণী মিটার ফিতে কেটে সুমতি প্রসূতি সদনের উদ্বোধন করলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত এককড়ি মুখার্জী এক সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, আমরা জানি সর্বনাশা দৈত্যকুল যতদিন ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র আঁকড়ে থাকবে ততদিন এদেশের সর্বস্ব লুঠে নিয়ে ওদের স্বদেশ ইংলন্ডকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর। আরও পরিষ্কার করে বললে, ওরা গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। স্বদেশের সর্বস্ব ভোগ করবে, বিদেশের সর্বস্ব লুঠ করবে। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা, দেশবাসীরাও যদি হাত গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি তবে ত এমনি অশিক্ষার অন্ধকারে, অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে, বিবেক-চৈতন্যহীন অবস্থায় চিরদিনই আমাদের ভুগতে হবে।

গ্রামবাসী নারী-পুরুষদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আন্তরিক প্রয়াসে, সরকারের আর্থিক সাহায্য ব্যতীত যে ভাবে সুমতি প্রসূতি সদন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তা সমগ্র দেশের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ স্থাপন করেছেন। আজ যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাকে সুষ্ঠু-ভাবে লালন পালন করে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কেবলমাত্র নারী-কল্যান-সমিতির সদস্যা-দেরই এ-কথা মনে করলে আমরা দারুণ ভুল করব। বরং একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদের, আমাদের—সকলের। এখানে নেতা হবার অত্যুগ্র লোভ কারো নেই। দলাদলি ও সংকীর্ণতার এতটুকুও স্থান নেই। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার তাগিদেই এখানে বড় হয়ে দেখা দিতে পেরেছে বলেই সুমতি প্রসূতি সদন এর মত একটি অত্যাবশ্যকীয় সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সদ্য জন্ম-লব্ধ প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখার অর্ধেক দায়িত্বভার আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিচ্ছি। অর্থাৎ এর জন্য যে-পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে ব্যয় হবে অর্ধেক আমি বহন করব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এদেশে নারীর স্থান কোন পর্যায়ে? নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তা কেন? আমরা নারীকে পরগাছা হিসেবে দেখে থাকি? আমৃত্যু পরমুখাপেক্ষী হয়েই ওদের কাটাতে হয়। জন্মের পর থেকে বাল্যে ও কৈশোরের দিনগুলো পিতা-মাতার ওপর নির্ভর করে কাটাতে হয়। যৌবনে স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হয়। স্বামী মদ্যপ ও লম্পট হলেও ওকে দেবজ্ঞানে সেবা করতে বাধ্য থাকে। বার্ধক্য কাটে সন্তান বা আত্মীয় স্বজনের হাতের মুঠোয়। পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর কোন অধিকার নারীর থাকে না। যদিও ভারতপথিক রামমোহনের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সহমরণ আইন করে বন্ধ করা হয়েছে, তবু কি এদেশ থেকে কুখ্যাত সহমরণ প্রথা সম্পূর্ণ লোপ পয়েছে? স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রলোভন ও বল প্রয়োগ করা হচেছ না? চতুর্দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই শুনতে পাবেন কত অসহায় নারী জঘন্য পণপ্রথার জন্য স্বামী ও শ্বশুরকুলের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মাহুতির পথকে আকড়ে ধরতে বাধ্য হচেছ' এর আসল কারণ কোথায়? আমি বলব, সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের আইন, ধর্ম ও নৈতিকতার অভাব। আর এর জন্য চাই স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রবলই নারীকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সক্ষম। কেবলমাত্র নারীজাগরণ বলে চিৎকার করলেই হবে না। নারীর চোখের ঠুলি খুলে ফেলতে হলে সবার আগে চাই অশিক্ষার অন্ধকার দূর করা। আজকের এই সভায় আমাদের এ-ব্রতই গ্রহণ করতে হবে যে, প্রতিটি মৌজায় না হোক প্রতি তিনটি মৌজায় আমরা একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রতি দশটি মৌজায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তুলব, যেখানে ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে পঠন পাঠনের সুযোগ পাবে। একাজে আমরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকব না। আন্তরিকতার সঙ্গে কর্মের বাস্তব উদ্যোগ নিয়ে, কেউ স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজন আমরাই মিটিয়ে নেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একে একের বোঝা বলে মনে হলেও দশের কাছে সামান্য তৃণ বলেই মনে হবে। গালে হাত দিয়ে বসে ভাববার সময় নেই। মোদ্দাকথা, আজ থেকেই আমরা কোমর বেঁধে,

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে পড়ছি—আপনারা আমার সঙ্গে যেতে রাজী কিনা, হাত তুলে মতামত ব্যক্ত করুন।

কয়েক হাজার নারী-পুরুষের হাত উর্ধ্বে উত্থিত হ'ল। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—রাজী! রাজী! রাজী।

এককড়ি এবার বললে, আমাদের এর পরের কর্মসূচী হবে প্রতি তিনটি মৌজায় একটি করে গ্রন্থাগার ও একটি করে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এককড়ির অর্থ, সুকল্যাণী মিটারের পরিকল্পনা ও মণিমালার একনিষ্ঠ কর্ম সাধনায় চারদিকে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। গ্রামের প্রতিটি মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে।

জলধি প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের তদারকি সেরে বিকেলের দিকে গায়ে জ্বর নিয়ে মেসে ফিরেছে। জামা-কাপড় না খুলেই চৌকিতে শুয়ে পড়েছে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা।

সন্ধ্যার মুখে এনা এসেছে গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে। মণিই ওকে পাঠিয়েছে। ক'দিন ধরে মণি প্রায়ই এনাকে জলধির কাছে পাঠাচ্ছে। উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ছল করে এরকম সুযোগ করে দেওয়াই হয়ত ওর উদ্দেশ্য। মণি মুখে কিছু না বললেও এটুকু বুঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ওর আছে। জলধিও এতে অনাগ্রহী নয়। হাজারো কাজের মধ্যে সারাদিন ডুবে থাকলেও এনা'র ছবি দু'-একবার মণের কোণে ভেসে ওঠে না, একথা বললে সত্য গোপন করাই হবে।

এনা জলধি'র চৌকাঠে পা দিয়ে বিস্ময় বোধ করল। বিষন্ন মুখে বললে, কি ব্যাপার, ভর সন্ধ্যা বেলা শুয়ে রয়েছেন যে! শরীর খারাপ, নাকি মন?

সারাদিন মন খারাপ ছিল. এখন মণে হচ্ছে শরীরটাই বিগড়েছে। জলধি ম্লান হেসে বললে।

এনা ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকে জলধি'র কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠে বললে, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে।

হাঁ, তা একটু হয়েছে বটে। এবার মনে হয় সেরে যাবে।

জলধি'র ইঙ্গিতটুকু এনার বুঝতে দেরী হ'ল না। ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললে, মনে হচ্ছে জ্বর এখন দুইয়ের কাছাকাছি।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জলধি বললে, কি জানি হতেও পারে।

হতে পারে নয় মশাই, হয়েছে। দুপুরে খেয়েছেন কি? হরিমটর।

মানে? কিছুই না?

মেস থেকে হারাধন ভাত নিয়ে গিয়েছিল। খেতে ইচ্ছে করল না, ফেলে দিয়েছি।

গায়ে এত জ্বর, রাত্রে দুধ-সাগু ছাড়া ত কিছু খাওয়াও চলবে না। ঘরে সাগু আছে?

এটা ত আর গৃহস্থের বাড়ি নয় যে, সাগু বার্লি বা শটিফুড মজুদ থাকবে। দুধ একটু হতে পারে। এক কাপ পেলেই রাত কাটিয়ে দেয়া যাবে।

ঠিক আছে, হারাধণদার সঙ্গে কথা বলে দেখছি, কি করা যায়। ভাল কথা, থার্মোমিটার আছে কি? জ্বরটা দেখতে পেলে ভাল হ'ত।

এখন বুঝছি, থার্মোমিটার রাখা দরকার। দেখি, জ্বর কমলে কাল একটা থার্মোমিটার কিনে রেখে দেব।

আপনাকে নিয়ে মহাবিপদ দেখছি মশাই! সব কিছুতেই রসিকতা! জ্বর কমলে থার্মোমিটার কিনবেন, কি দরকারে লাগবে?

ভবিষ্যতে যদি আবার জ্বর হয়। কিছুদিনের মধ্যে ত জ্বরটর হয় নি। তাই—

এনা আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরে হারাধনের কাছে গেল। মেসের অন্য বাসিন্দারা সবাই বাড়ি গেছে। প্রতি শনিবার বিকেলে বাড়ি যায়, সোমবার সকালে ফেরে। তাই হারাধনের কাজের চাপ মোটেই নেই। সে এনাকে জলধির কাছে রেখে সাগু সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরর মধ্যেই সাগু নিয়ে ফিরে এল। এনা আর দেরী করল না। মণি'র সঙ্গে দেখা করে জলধি'র জ্বরের খবরটা দিল।

মণি মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ওর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স নিয়ে সাইকেলে চেপে জলধি'র মেসে এল। ওষুধের ব্যবস্থা করে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরল।

পরদিন খুব সকালে এনা জলধি'র মেসে এল, জলধি'র জ্বর কমেছে, নেই বললেই চলে। এনা ওর কপালে হাত দিয়ে মুচকি হেসে বললে, এযে ভল্লুকের জ্বর মশাই! কাল রাত্রে দেখে গেলুম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, এখন যে একেবারেই ঠাণ্ডা।

জলধি ম্লান হেসে বললে, এখানে সুবিধে হবার নয় জ্বর ভালই জানে। তোয়াজ করার লোক কোথায় যে এখানে থাকবে, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পালিয়ে গেছে।

এনা চৌকির ওপর জলধি'র খদ্দরের পাঞ্জাবীটা দেখে বললে, এটা এখানে কেন?

ভাবছি, একবারটি বেরবো। কাল কাজটা আধখাঁচরা অবস্থায় ফেলে এসেছি।

এনা পাঞ্জাবীটা দড়িতে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বললে, আজ কিছুতেই আপনার বেরনো চলবে না। কাল রাত্রে যার দুইয়ের ওপর জ্বর ছিল তিনি রোদের মধ্যে—

মণি বারণ করে আমায় পাঠিয়েছে। এককড়িদাকে বলে ও অজয় বাবুর ওপর আপনার কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। আজ আপনার ফুল রেস্ট। বুঝলেন মশাই, কিছুতেই মেসের বাইরে যাওয়া চলবে না। আমার জরুরী কাজ আছে, আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরছি। মণিও সকালেই একবারটি আসবে বলেছে।

এনা জলধি'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এদিকে নারী-কল্যাণ-সমিতি এবং স্বদেশ-কল্যাণ-সমিতির পারস্পরিক সহযোগিতায় গঠনমূলক কার্যাদি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মণি উদ্যোগ নিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে সহর থেকে পনেরটি চরকা আনিয়ে ইতিমধ্যেই পনেরটি পরিবারকে দিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে পাঁচটি তাঁতও আসার কথা। গ্রামের মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় করে না দেয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র গরম গরম বক্তৃতার মাধ্যমে ত আর অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়, এই বিষয়ে ওর ভালই জানা আছে।

মণি বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে চরকার ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাসায় ফিরছিল। এমন সময় দেখল, পথের বাঁকে ভাঙা শিব-মন্দিরের বারান্দায় বসে কে একজন লোক। বসে বিড়ি ফুঁকছে। ওকে দেখেই সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসল। লোকটা এ-গ্রামে বা ধারে কাছে কোথাও থাকে বলে মনে হ'ল না। গ্রামের সবার মুখ ওর চেনা। তবে এ-ও মনে হ'ল কোথায় যেন দেখেছে ওকে। এবার মনে পড়েছে, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফেরার পথে ট্রেনে এ-অবাঞ্ছিত ও লোকটি মুখোমুখি বসে হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

জলধি'র মেসে গিয়ে মণি ওকে ব্যাপারটা বললে। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে জলধি শিব মন্দিরের কাছে ছুটে এল। কিন্তু ভোঁ ভাঁ, পাখী পালিয়েছে। হতাশ মনে ও আবার মেসে ফিরে এল। জলধি বললে, মণি আমার মনে হয় নচ্ছাড়টা নির্ঘাৎ টিকটিকি। তোমার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্থানীয় থানা হয়ত কিছু অনুমান করেছে।

মণি আরাম কেদারায় গা-এলিয়ে বসেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, অনুমান ত অনেকেই অনেক কিছু করতে পারে জলধিদা। কে, কি অনুমান করল এনিয়ে ভেবে নষ্ট করার মত সময় কোথায়। তবে আমাদের ধারণা ভুলও হতে পারে।

তবু কয়েকটা দিন একটু সতর্ক থেকো।

মণি আর প্রসঙ্গটাকে দীর্ঘ করতে দিল না। সাইকেল নিয়ে পথে নামল।

দুপুরের দিকে জলধি ওর প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরীর কাজ তদারক করছে। এনা বাড়ি ফেরার পথে ওর কাছে এল। বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। কয়েকটা মামুলি কথা সেরে বিদায় নিল। জলধি সতর্কতার সঙ্গে শিব-মন্দিরের অবাঞ্ছিত লোকটার কথা ওর কাছে চেপে গেল। মেয়েদের পেটে কথা হজম হয় না। যতই নিষেধ করা যাক না কেন, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক দশ কানে দেবেই।

সন্ধ্যার কিছু আগে জলধি কাজ থেকে ফেরার পথে এককড়ির বাড়ি গেল। কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলে উঠার উদ্যোগ করল। মণি'র প্রসঙ্গে এককড়ি কোন কথা উত্থাপন করল না। জলধিও আগ বাড়িয়ে কিছু বলা সঙ্গত মনে করল না। প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি নিয়ে মেসে ফিরল।

পরদিন জলধি কাজে যাওয়ার সময় একটু ঘুর পথে মণি'র বাসায় গেল। ওর ঘরে তালা ঝুলছে। বাড়িওয়ালিকে জিজ্ঞেস করে জানল, খুব ভোরে কোথায় বেরিয়েছে। সাইকেলটা ঘরেই রয়েছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ধারে কাছে কোথাও গেলে সাইকেল নিয়ে যায়। নির্ঘাৎ দূরে কোথাও গেছে। জলধি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, আশ্চর্য মেয়েরে বাবা! কখন, কোথায় যায়, কারো কাছেই প্রকাশ করে না।

জলধি ভেবেছিল, দুপুরের দিকে ওকে হাটের কাছে যে-সেতুটা মেরামত হচ্ছে, ওখানেই পাওয়া যাবে। কাজের ফাঁকে একবারটি ওখানে গেল। কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল, মণি আজ একবারের জন্যও আসে নি এখানে।

জলধি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। কাজে মন বসল না। সারাটা দুপুর গোমড়া মুখেই কাটাল।

বিকেলে কাজের শেষে জলধি মণি'র বাসায় গেল। এনা'র সঙ্গে দেখা। মণি'র জন্য অপেক্ষা করছে। পরদিন কোথায় কি করবে, নির্দেশ নিতে এসেছে। ওর দেখা না পেয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে রোয়াকে বসে অপেক্ষা করছে।

জলধি যে সকালে কাজে যাওয়ার সময় মণি'র খোঁজ করে গিয়েছিল ব্যাপারটা এনার কাছে গোপন রাখল। ওর দুশ্চিন্তাটাকে উস্কে দিতে চায় না। শিব-মন্দিরে রওই অবাঞ্ছিত লোকটির কথাও ফাঁস করল না।

জলধি রোয়াকে এনার কাছাকাছি বসল। বাড়িওয়ালি ভদ্র-মহিলা চা-মুড়ি এনে দিল।

জলধি এক থাবা মুড়ি গালে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, মণি যেভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে, অসুখ বিসুখ বাধিয়ে না বসে।

এনা চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়েও আবার নামিয়ে আনল। বিষণ্ণ মুখে বললে, ঠিক বলেছেন, ক'দিন ওর বিশ্রাম নেয়া খুবই দরকার।

বিশ্রামের কথা বললেই মণি হেসে উড়িয়ে দেয়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, যারা সত্যিকারের কর্মী ওদের নাকি বিশ্রামের দরকার হয় না।

আশ্চর্য মেয়ে রে বাবা! এদিকে নারী-কল্যাণ সমিতির কাজ করতে গিয়েই আমরা হিমসিম খাচ্ছি। এনা বললে।

ওর ত আবার বাড়তি কাজের ঝামেলাও কম নয়। নিয়মিত রমেন-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র এলে ত স্নান-খাওয়ার কথা ভুলে যায়।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে মণি'র মনে কিছুটা হতাশা জন্মেছে।

জলধি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে এনার দিকে তাকাল। খালি চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বললে, হঠাৎ এ-কথা বললে যে! মণি নিজে কিছু বলেছে, নাকি এটা তোমার মস্তিষ্ক প্রসূত উক্তি?

না, তেমন কিছু বলে নি বটে। ও-ত এমনিতেই খুবই চাপা, জানেনই ত জলধিবাবু।

হাঁ, কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। এক সঙ্গে এতদিন কাজ করছি, একটা কথাও যদি কোনদিন নিজে থেকে বলত! শুধুমাত্র এটুকুই জানি, সন্ত্রাসবাদী দলের ও একজন সক্রিয় কর্মী। আর—

আর মাঝে মধ্যে হঠাৎ কোথায় ডুব দেয়। কখনও রাত্রে ফেরে, নইলে পরের দিনও বে-পাত্তা হয়ে থাকে। সত্যি লীলাময়ীর লীলা বুঝা ভার।

রমেনবাবুর সঙ্গে হয়ত কিছুদিন মণি'র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিদেশে পাড়ি দেবার পর প্রথম প্রথম ভদ্রলোক ক'টা চিঠি দিয়েছিলেন। সবই সাংকেতিক ভাষায় লেখা। একটা চিঠি ঘটনাচক্রে আমার হাতে পড়েছিল। কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলুম না। চুরি করে পড়ব ব'লে সন্তর্পণে খামটার মুখ খুলে দেখি, এক কোণায় শুধুমাত্র লেখা 'O.K'। ব্যস ওপরে কোন সম্বোধন নেই, শেষে নাম স্বাক্ষর পর্যন্ত নেই। ব্যাপার জানা না থাকলে কার বাপের সাধ্য, কে দিয়েছে, কোত্থেকেই বা চিঠিটা এসেছে। মণি এর কি উত্তর দিয়েছিল জানি না।

এনা বললে, গত তিন-চারদিন আগে পথ চলতে-চলতে মণি'র কাছে আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলুম।

তারপর? কি বললে মণি?

কিছু কি বলতে চায় নাকি! আমি যতবারই ও প্রসঙ্গ শুরু করি, মণি তা চাপা দেবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালায়। আমিও নাছোড়বান্দা, কিছু না শুনে ছাড়ছি না। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে দু'-চার কথা যা বললে তা হল—চট্টগ্রাম অভিযানে মণি আর রমেন-এর অবদান অবিস্মরনীয়। বিপ্লবীদের অনেক অস্ত্র যুগিয়েছে ওরা। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেছে ঘটনা-প্রবাহ অন্যদিকে বয়ে গেছে। আশানুরূপ ফল ওরা পায় নি। ওরা চেয়েছিল আরও অনেক, অনেক বেশী, ফলে যেটুকু পেয়েছে তা খুবই সামান্য। তার পরও রমেন বিদেশ থেকে ভিক্ষেসিক্ষে করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠিয়েছে। তা আর চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় নি। আসলে তার আগেই সেখানকার প্রয়োজন মিটে গেছে। আন্দোলন ছাইচাপা পড়ে গেছে। ফলে অস্ত্রশস্ত্রগুলো বিভিন্ন গোপন স্থানে জমা করে রাখা হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষদের শাসনের নামে যে অপশাসন চালাচ্ছে, বল্গাহীন অত্যাচার চালাচ্ছে তার অবসান ঘটিয়ে বে-স্বরাজ মানার জন্য দেশ হিতৈষিরা নানা স্থানে কর্মকাণ্ডের আয়োজন করছে প্রয়োজনে এসব অস্ত্র

ওদের হাতে তুলে দেবার আশায়ই সরিয়ে রাখা হয়েছে। আন্দোলনের কাজ দ্রুত গতিতে না হলেও যে একেবারে স্তিমিত হয়ে গেছে এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। পর পর কয়েকজন আত্মম্ভরী শাসককে খুন করা হয়েছে। রুই কাংলা না হলেও একেবারে চুনোপুঁটির পর্যায়ে অবশ্যই ওদের ফেলা যায় না। আর কয়েকজন অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকেও খুন করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা গুলি খাওয়া বাঘের মত ক্ষিপ্ত হয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে কয়েকজন সাধারণ ও নিরীহ দেশবাসীকেও ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়ে স্বেচ্ছাচারের চরম নিদর্শন রেখেছে।

এখন পরিস্থিতি ক্রমশঃ যেদিকে মোড় নিচ্ছে মণি কি বুঝছে না, বিপ্লবের কাজ করা এখন খুবই কঠিন! সন্ত্রাসবাদী দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের কেউ ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, কেউ বন্দুকের গুলিতে নির্মমভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। জলধি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে।

যারা গেছে ওরা মরে বেঁচেছে। আর যারা বেঁচে আছে ওদের অনেকেই জেলখানা পড়ে ধুঁকছে। আর অন্যান্য যারা আজও জেলের বাইরে রয়েছে ওদের অনেকেই মায়ের কোলে ফিরে গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত ঘর-সংসার পেতে বসেছে।

জলধি বললে মণি'র মত বিপ্লব যাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে, ওরাই পড়েছে ফ্যাসাদে। না পারছে সংসারে ফিরে গিয়ে ঘরের কোণে মাথা গুঁজতে, আর না পারছে বিপ্লবের আগুন কে জ্বালিয়ে রাখতে।

এনা বললে, দেখছেন, ইংরেজ সরকার চারদিকে কেমন অত্যাচারের স্টীম-রোলার চালাচ্ছে। এমন কি গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত স্পাই ঢুকে পড়েছে। পাতালের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও রেহাই নেই, টেনে হিঁচড়ে বের করে আনছে। আঘাতের পর আঘাত হেনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনগুলোকে একেবারে কোমড় ভেঙে দিয়েছে।

শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের কথাই বা বলি না কেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষই আজ স্বরাজের কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। রাজনৈতিক ক্রিয়া কাণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চুপ-নিস্পৃহ থাকাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছে। বিপ্লব-আন্দোলন ভাটা না পড়ে যাবে কোথায়! চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে।

আমি কিন্তু বলব, মণি'র এখন আর দু' নৌকোয় পা না রাখা ঠিক নয়। আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে নারী-কল্যাণ-সমিতির কাজে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা উচিত।

আমরা হায় হায়! করলে কি হবে, সমস্যার কথাটা যে আগে ওর মাথায়ই আসা উচিত ছিল। ওর যা ক্যালিভার রয়েছে, অর্থাৎ মানুষের মনে নিজের আসন পেতে নেয়ার যে ফর্মাল ও ইনফর্মাল এক্টিভিটি রয়েছে তা অন্য কারো মধ্যে সচরাচর চোখেই পড়ে না।

খুবই সত্য কথা একবড়িদার মত মানুষকে কেমন কর্মীভন্স করিয়ে একেবারে মাঠে নামিয়ে ছেড়েছে, দেখেছেন জলধিবাবু। ভদ্রলোক এ-বয়সেও সারাদিন ছাতা মাথায় একবার স্কুল তৈরীর কাজ দেখতে যাচ্ছেন, কখনও ব্রীজ মেরামতির কাজ তদারক করছেন, আবার কখনও বা রাস্তার ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মেরামতের কাজ দেখছেন।

জলধি বললে, শুধু কি তা-ই? স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের যেসব সদস্যকে গাঁটের পয়সায় গাড়ী-ভাড়া দিয়েও জমায়েত করা যেত না, আজ ওরাও কেমন সমাজ সেবার কাজে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে লক্ষ্য করেছেন? ওর সবল নেতৃত্ব ও অনন্য সাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ভিন্ন এরকম অসাধ্য সাধন সম্ভব ছিল না। চারদিকে রীতিমত কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। যে-কাজ গভর্ণমেণ্টের করা উচিত তা গ্রামের মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেয়ার ক্ষমতা যার তার থাকে না!

গভর্ণমেণ্টের উৎসাহের সঞ্চার ত হওয়ার কথা নয়। শাসক বিদেশী, ওরা ত এদেশের মানুষের সুযোগ-সুবিধার কথা না ভেবে কেবলমাত্র কি করে এদেশকে দোহন করবে সে-চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকবে। আর এটাই স্বাভাবিক। একবড়িদার আর্থিক সঙ্গতি আর মণির সঠিক-সবল নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা—মণি-কাঞ্চন যোগ বলা যেতে পারে। জ্ঞানীরা বলেন, টাকার জন্য কাজ আটকে থাকে না, থাকে সুযোগ্য কর্মীর জন্য। কর্মীর পিছনে টাকা ছুটে যায়।

একেবারে যথার্থ বলেছেন। কাজ করার মত আন্তরিক তাগিদ ও মানসিকতা না থাকলে দেশ ও দশের হিতার্থে কিছু করা সম্ভব নয়। যে-একবড়িদা বৈঠকখানায় আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে দেশোদ্ধার সাঙ্গ করতেন, আজ তিনি রণক্ষেত্রে, নিরলস যোদ্ধা, ভাবা যায়!

এমন সময় মণি কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বারান্দায় উঠল। এনা ও জলধি ব্যস্ত হয়ে উঠে ওর দিকে এগিয়ে গেল। জলধি বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, সারাদিন কোথায় ছিলে মণি? শুনলুম, সেই সকালে বেরিয়েছ, আর—

মণি ঘরের তালা খুলতে খুলতে বললে, হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল কলকাতা চলে গিয়েছিলুম। নারী-কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে গভর্ণমেণ্টের কাছে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ রোধ, কুখ্যাত পনপ্রথা রোধ, চাকরিক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমবেতন আর পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত যে আবেদন করা হয়েছিল তারই তদ্বির করে এলুম।

এনা বললে, কি বুঝলে, কাজ এগোচ্ছে? আমাদের দাবীগুলো গভর্ণমেণ্ট মেনে নিতে স্বীকৃত—

এত তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দিয়ে দেবেন ভেবেছ! তবে ফাইল মুভ করছে। কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে সচেতন এটাই বুঝে এলুম। সব দাবী পুরোপুরি না মানলেও অধিকাংশই যে মেনে নিতে অগ্রহী। এটুকু অন্ততঃ বুঝে এলুম। আশা করা যাচ্ছে, কয়েক দিনের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট—

জলধি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললে, মণি নারী কল্যাণ সমিতি, বিশেষ করে তোমার মহান কীর্তির কথা আগামীকালের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

অতসব ভাবিনি জলধিদা। শুধুমাত্র এটুকুই জানি, আমরা আজ আছি, আগামীকাল হয়ত থাকব না।

কিন্তু আগামীকাল আমাদের উত্তরসূরী যারা থাকবে ওদের জন্য সিন্ধুতে বিন্দুসম হলেও কিছু করে গেলুম। তৃপ্তিটুকু যে কোন মূল্যে দিয়েই কেনা যায় না জলধিদা। আগামীকাল যে-নতুন সূর্য আত্মপ্রকাশ করবে ওকে সুনির্মল করে তোলার জন্য আমার যে মানবিক কর্তব্য ছিল তা পালন করলাম মাত্র। জন্মভূমি ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তর ধরে যে সঞ্চিত আবর্জনা জমে ছিল তা অন্ততঃ সরিয়ে দিতে পারলুম এই সান্ত্বনা এই তৃপ্তিটুকুর মূল্যও কম নয়।

মণি, তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম কর। আমরা বরং এখন আসি।

হাঁ ভাই, অনেক রাত হয়েছে। তোমাদের আবার এতটা পথ যেতে হবে। শুভরাত্রি। আগামীকালের সকাল মধুময় হোক।

জলধি ও এনা বিদায় নিয়ে নিজনিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

মণি ক্লান্ত দেহে বিছানায় আশ্রয় নিল।

শেষরাত্রে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। মণির ঘরের দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হতে লাগল। মণি'র ঘুম ভেঙে গেল। বিস্ময়ভরা চোখে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ল না। এদিকে দরজায় কে বা কারা যেন ঘনঘন ধাক্কা দিচ্ছে আর পুরুষকণ্ঠে দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। মণি বুঝে নিল, শেষরাত্রে কারা বাড়ি বয়ে ওকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে। বালিশের তলা থেকে গুলিভরা পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। এবার ধীর পায়ে দরজা খুলে দিল। চোখের পলকে তিন তিনটে রাইফেলের নল ওর বুকের ওপর চেপে ধরল। পুলিস ইন্সপেক্টর মিঃ সোম গর্জে উঠলেন।

হ্যান্ডস আপ।

মণি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। পিস্তল সমেত হাত দুটো ঊর্দ্ধে উত্থিত করল। মিঃ সোম ওর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলেন। কয়েকজন পুলিশ ওর ঘরে তল্লাসি চালিয়ে কয়েকটা পিস্তলের গুলি, দেশী ও বিদেশী ডাকঘরের ছাপ মারা কয়েকটা চিঠি বের করে এনে মিঃ সোমের হাতে তুলে দিল। মিঃ সোম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসের উদ্দেশ্যে বললেন, হাতকড়া পরিয়ে গাড়ীতে তোল।

ইতিমধ্যে হৈ হট্টগোল শুনে গ্রামবাসী নারী-পুরুষ ও শিশুরদল ভীত সন্ত্রস্ত মুখে মণি'র বাড়ির দরজায় জড়ো হয়েছে। খবর পেয়ে এককড়ি, জলধি, এনা ও হেনা প্রভৃতিরাও ছুটে এসেছে।

মণি গাড়ীতে ওঠার মুখে এনার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, এনা, তোমার আর

জলধিদার ওপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেলুম। আমার অপূর্ণ কাজটুকু তোমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। তোমাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে আগামীকালের সকাল মধুময় হয়ে উঠুক। সমবেত শিশুদের লক্ষ্য করে এবার বললে, আগামীকালের এসব নাগরিক-দের মুখে হাসি ফুটাবার দায়িত্ব তোমাদের ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। সুখে থেকো বোন।

এনা ও জলধি নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল।

মনি এবার এককড়িকে প্রণাম করে পুলিসের গাড়ীতে উঠল। ধীর গতিতে গাড়ী এগিয়ে চলল।

শিশুরা গাড়ীটার পিছন পিছন ছুটতে লাগল।

সমাপ্ত